ষাটের দশকে যে অবস্থায় ছিলেন এখন সে অবস্থা থেকে উন্নতি তো দূরের কথা, সেখান থেকে বহু ধাপ নিম্নগামী হয়েছেন। এদের অধিকাংশদের নিজস্ব নৌকা ও জাল নেই, দাদন আর ঋণের কষাঘাতে তারা নিষ্পেষিত, জল-দস্যু ও সন্ত্রাসীদের আক্রমণে সহায় সম্বল হারানো আজকাল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে । মরার উপর খাঁড়ার ঘাঁ" হয়ে দাড়িয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন। আজ যে জেলে বউটি চোখ ভিজিয়ে স্বামীকে সমুদ্রে পাঠায় এক বুক প্রত্যাশা নিয়ে সুদিনের আশায়, কাল তা বন্যার বাঁধ না মানা স্রোত হয়ে ফেরে। আজ যে দুধের সন্তান পরম আদরের বাবাকে বিদায় দিল আগামীকাল ঘরে খাবার আসবে আশায়, কাল সে বাবাটি আর ঘরে ফিরছে না। জেলে বউ হচ্ছে বিধবা, সন্তান হারাচ্ছে বাবা- সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে জেলে পরিবার। এভাবে দিনে দিনে একের পর এক বিপর্যয় নেমে আসছে প্রাথমিক উৎপাদক - মৎস্যজীবীদের জীবনে । যতই এরা গরীব হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ততই চাপ বাড়ছে। বর্তমানে টিকে থাকার স্বার্থে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে তাই তারা প্রচলন ঘটিয়েছে বেহুদ্দি জাল, কারেন্ট জালসহ বিভিন্ন ক্ষতিকারক জালের। জালের মেস-সাইজ কমতে কমতে এখন শূন্যে ঠেকেছে । তবুও যে ভরে না ডালা। কিশোর ও পোনা মাছ ব্যাপকহারে নিধন হচ্ছে। যার ক্ষতিকর প্রভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য - তথা সম্পদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মৎস্যজীবীদের ভাগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর জাতিসংঘের ইউ এন ডি পি এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহায়তায় "উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকার নিরাপত্তার জন্য ক্ষমতায়ন " শীর্ষক প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলার ১১৮টি জেলে গ্রামে ২০০১ সন থেকে বাস্তবায়ন করছে । একটি সামর্থ্যবান পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে গরীব মৎস্যজীবীদের জীবিকার নিরাপত্তার উন্নতি সাধনই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য যাতে সম্পদ ও জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রাপ্তিতে তাদের পথ সুগম ও সাবলীল হয়। পাশাপাশি উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্যজীবীদের মাঝে গনসচেতনা সৃষ্টি হয় যাতে সমাজভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাস্তাবায়নের মাধ্যমে তারা সমুদ্রের বিপুল সম্ভাবনাকে উন্নয়ন কাজে লাগতে পারে।

প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য

একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে ইতোমধ্যেই উক্ত প্রকল্পটি বেশ সাড়া জাগিয়েছে । এটা কোন পুনর্বাসন প্রকল্প নয়, এটা একটা টেকনিক্যাল এসিষ্টেন্স বা কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। কারিগরী সহায়তা প্রকল্পে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের কোন বিধান বা সুযোগ নাই, বরং তাদের সুসংগঠিত করে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানই এর মূল বৈশিষ্ট্য। তাই ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের পূনর্বাসন করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য নয় বরং দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরী প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ বৃদ্ধি ও লিংকেজ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তি উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নই প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য যাতে মৎস্যজীবীগণ নিজেদের সমস্যসমূহ নিজেরা চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের জন্য নিজস্ব পরিকল্পনায় নিজেরাই কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে- যেখানে তাদের জীবন ধারণের সকল উপাদান যেমন: শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, বিকল্প কর্মসংস্থান, বিশুদ্ধ পানি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আইনি সহায়তা ইত্যাদি প্রাপ্তিতে সহায়ক পরিবেশ বিরাজ করবে, পাশাপাশি তারা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় সমাজভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ত-বায়ন করতে পারবে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি তাদের এই ব্যক্তি উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ধাপে ধাপে বিভিন্ন ধরণের কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এই প্রকল্পের সাফল্য বা ব্যর্থতার সাথে শুধুমাত্র কক্সবাজার বা বাংলাদেশেরই নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি অসহায় ও ভাগ্য-বিড়ম্বিত মৎস্যজীবীদের ভাগ্য জড়িত। প্রকল্পের সাফল্য সারা পৃথিবীতে অবহেলিত জনগনের ভাগ্যোন্নয়নে মডেল হিসাবে কাজ করবে। মাঠকর্মীসহ প্রকল্পের সকল কর্মীবাহিনীর দক্ষতা ও মৎস্যজীবীদের নিরলস প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যেই কক্সবাজারের জেলে গ্রামগুলোতে সাফল্যের সূর্যোদয় ঘটছে যা বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সংস্থাসহ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন মিশন কর্তৃক সবিশেষ প্রশংসিত হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমুদ্রে মাছ ধরাই মৎস্যজীবীদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। দিনে দিনে মৎস্যজীবীগণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ায় সমুদ্র সম্পদের ওপর ক্রমান্বয়ে চাপ বাড়ছে। মৎস্যজীবীদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ ছাড়া বিকল্প নেই। আর একমাত্র সুসংগঠিত হওয়ার মাধ্যমেই মৎস্যজীবীগণ এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান করতে পারে। এসব দিক বিবেচনায় এনে উক্ত প্রকল্প তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে :

(১) সকল মৎস্যজীবীদের গ্রাম-ভিত্তিক সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা,

(২) অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ কমে, এবং

(৩) সমুদ্র সম্পদের সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি ও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ ।

প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পকর্মী ও মৎস্যজীবীদের কর্মদক্ষতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যেই প্রতিটি বিষয়ে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রকল্পের ১১৮টি জেলেগ্রামে একটি করে পুরুষ ও মহিলা সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি সংগঠন সদস্যদের নিজস্ব মাসিক চাঁদায় ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সঞ্চয় তহবিল গড়ে তুলেছে। ইতোমধ্যেই প্রতিটি সংগঠনের মোট সঞ্চয় দাড়িয়েছে প্রায় ৬০,০০০-১০০,০০০ টাকা যা তাদের মানসিক শক্তি, দরকষাকষির ক্ষমতা ও কর্মস্পৃহাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। যে মৎস্যজীবীদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটি পর্যাপ্ত ছিল না আজ তাদের মোট সঞ্চয়ের পরিমান প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। এ বিপুল পরিমাণ সঞ্চয় থেকেই তাদের সংগঠিত হওয়ার শক্তি ও প্রকল্পের কর্মীবাহিনীর দক্ষতা ও নিষ্ঠা প্রমাণ করে । প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ পর্যন্ত বিদেশে শিক্ষা সফরে গিয়েছেন ৫৮ জন মৎস্যজীবী। প্রকল্প কর্তৃক দেয়া ভাতা থেকে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় তাদের গ্রাম সংগঠনে জমা হয়েছে।

মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠনগুলো নিজেদের কর্ম-পরিসর বৃদ্ধি ও শক্তি অর্জনের জন্য গড়ে তুলেছে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি, উপজেলা মৎস্যজীবী ফেডারেশন ও জেলা মৎস্যজীবী ফেডারেশন। ইতোমধ্যেই প্রকল্পের সহায়তায় উপজেলা ও জেলা মৎস্যজীবী ফেডারেশনসমূহ সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য র‍্যালি অনুষ্ঠান, উপজেলা ও জেলা প্রশাসনে স্মারকলিপি প্রদান ছাড়াও ক্ষতিকর জাল ব্যবহার ও পোনা নিধনের বিরুদ্ধে তিনটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং নিজেরা তা বাস্তবায়ন করছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাফল্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় মৎস্যজীবীদের ক্ষমতায়নের জন্য ৭টি মৌলিক বিষয়ের ওপর কার্যক্রম চলছে। বিষয়গুলো হচ্ছে সোস্যাল মোবিলাইজেশন, প্রাথমিক শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি, পরিচ্ছন্নতা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য, অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আইনি সহায়তা ও সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা জেলার ৮টি উপজেলাকে দুটি প্রধান কর্ম এলাকায় বিভক্ত করে ১৩টি এনজিও কে উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সোস্যাল মোবিলাইজেশনের আওতায় ১১৮ টি গ্রামে ২৪৮ টি গ্রাম সংগঠনের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান, সঞ্চয় সংগ্রহ, ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি, উপজেলা ও জেলা ফেডারেশনের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদানসহ সংগঠন শক্তিশালীকরণ ও নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্প এলাকায় নিজস্ব ভবনে এবং সকল ক্ষেত্রে গ্রামের মহিলা শিক্ষক দ্বারা ৪৬ টি প্রাথমিক স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি স্কুল ২য় বর্ষে পদার্পন করেছে। স্কুল পরিচালনার জন্য স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালনা ও টেকসই রাখার জন্য নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি উপযোগী ছাত্রের আধিক্যহেতু প্রকল্প সাহয়তায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনী পরিচালনার বাইরে মৎস্যজীবীগণ নিজস্ব উদ্যোগে দ্বিতীয়/তৃতীয় শিফটের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১টি বা ২টি ১ম শ্রেণী পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিক্ষকদের ১২ দিনব্যাপী মূল প্রশিক্ষণ দেয়ার পর প্রতিমাসে ১ দিন করে রিফ্রেসার ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি স্কুল পরিচালনা পরিষদকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে যাতে প্রকল্প কার্যকাল শেষ হওয়ার পরও স্কুল কার্যক্রম বিরতিহীনভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বিশুদ্ধ পানি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় প্রতিটি গ্রামের সকল টিউবওয়েলের প্লাটফর্ম পাকা করা সহ যাবতীয় মেরামত করে সচল রাখা হয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক সরকারী সংস্থা থেকে টিউবওয়েল

বসানোর জন্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। গ্রামের সবাই যেন স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প থেকে প্রতিটি গ্রামে ৪টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন বসানো সহ সবাইকে নিজস্ব সেনেটারি ল্যাট্রিন বসাতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক জেলে গ্রাম নিজেদের উদ্যোগে ৬০-৭০ ভাগ সেনেটারি পায়খানা স্থাপন করেছে। প্রতিটি গ্রাম সংগঠনে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সহ ১টি করে ফার্স্ট এইড বক্স প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক সহ অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য মৎস্যজীবীদের সাথে বিভিন্ন সংস্থার যোগাযোগ করে দেয়া হচ্ছে। মুমূর্ষ রোগীদের জন্য প্রকল্প সহায়তায় কক্সবাজার হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে রক্তের প্রয়োজন হলেও শুধুমাত্র জেলে বলে মৎস্যজীবীরা কোথাও থেকে রক্ত পায় না- এ নিদারুণ সত্যটুকু উপলব্ধি করে মৎস্যজীবীরা প্রকল্প সহায়তায় নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠান করে প্রায় ২০০ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করেছে। কক্সবাজারের প্রত্যন্ত উপজেলাগুলিতে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ইতিহাসে এই প্রথম যা অনুষ্ঠানের দাবীদার একমাত্র মৎস্যজীবীরাই। রক্তদানের মাধ্যমে সন্ধানীর কাছ থেকে পাওয়া ডোনার কার্ড আজ তাদের জরুরী প্রয়োজনে রক্ত প্রাপ্তিতে স্বাবলম্বী করেছে-যা দিয়ে সাহায্য করতে কেউ কোনদিন এগিয়ে আসেনি বরং জলদাস/জেলে বলে চিরদিন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। জেলে গ্রামের প্রত্যেককে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, উঠতি বয়েসী মেয়ের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। প্রতি গ্রামে মৎস্যজীবীদের মধ্য থেকে ১ জন করে কমিউনিটি হেলথ একটিভিষ্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে যারা সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ ও সেবা প্রদান করছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর জন্য মৎস্যজীবীগণ নিজেদের প্রচলিত পেশা ও সম্ভাবনাময় পেশা চিহ্নিত করে গ্রামভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতিটি গ্রামে নিজস্ব সম্পদ ও দক্ষতার ভিত্তিতে মৎস্যজীবীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে ইতোমধ্যে প্রায় আট শতাধিক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মূলধনের জন্য বিভিন্ন অর্থ-প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে দেয়া হচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে তাদের ব্যবসাতে ইতোমধ্যে সাফল্য এসেছে। প্রকল্প থেকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদানের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার আওতায় প্রায় ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ইউএনডিপি এর গ্লোবাল পলিসি পরিবর্তনের কারণে অতি সম্প্রতি ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তাকে ক্ষুদ্র তহবিল অনুদান সহায়তায় পরিবর্তন করে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে দেয়া প্রস্তাব এফএও তে যাচাই বাছাই হয়ে অনুদান সহায়তা সরাসরি চেকের মাধ্যমে গ্রাম সংগঠনের ব্যাংক একাউন্টে জমা হচ্ছে।

সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য "ক্ষুদ্র মূলধন অনুদান বা MCG" উক্ত প্রকল্পের একটি অভিনব সংযোজন। মৎস্যজীবী গ্রামে তিন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে এই অনুদান সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসা সৃষ্টি ও গ্রাম-ভিত্তিক রিসোর্স রিজেনারেশন। আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নই শুধু নয়, মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ বন্ধ করে, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কমিয়ে অংশগ্রহণমূলক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সরাসরি কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য এই ক্ষুদ্র মূলধন অনুদান যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। অনুদানকৃত টাকা এফএও থেকে সরাসরি গ্রাম সংগঠনে জমা হয়। প্রতিটি ব্যবসা দল নিজেদের ২০% ম্যাচিং ফান্ড জমা দেয়ার পর অনুদান পাওয়া টাকা মিলিয়ে সংগঠনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে ৩০% হারে টাকা সংগঠনের তহবিলে জমা দেয়া হয়। এভাবে অনুদান পাওয়া পুরো টাকা সংগঠন কর্তৃক বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে সংগঠনে ফেরত দেয়া হয় যা আবার অন্য কোন দলকে ব্যবসার জন্য দেয়া যায়। এই পদ্ধতিতে সফল ব্যবসা পরিচালনার জন্য মৎস্যজীবীদের ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি গ্রাম সংগঠনের সঞ্চয়ের পরিমান বহুগুণ বেড়ে যাচেছ। এভাবে বহুমাত্রিক হারে মৎস্যজীবীদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে।

উক্ত কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ১০৭টি প্রকল্পে ক্ষুদ্র তহবিল অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫ টি গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন, ৬১ টি ব্যবসা উন্নয়ন ও ১ টি রিসোর্স রিজেনারেশন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ১০৭ টি প্রকল্পে মোট ৯৯,৫৪,৫৮২/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মৎস্যজীবী নিজেরা ক্ষুদ্র তহবিল অনুদান প্রাপ্ত সহায়তার পাশাপাশি কমপক্ষে ২০% অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছেন যার পরিমাণ ২১,৮০,০০০/- টাকা।

৬১টি ব্যবসা উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বমোট ৫১৮ জন মৎস্যজীবী নিয়োজিত আছেন। এছাড়া কমিউনিটি অবকাঠামো উন্নয়ন এর মাধ্যমে ৪৫ টি প্রকল্প থেকে সর্বমোট ২,৮০,০০০ মৎস্যজীবী তাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ ও ক্ষমতায়ন করতে পারছে। মোট ৬১টি প্রকল্পের মধ্যে ২৫ টি নেট মেকিং, ১৩ টি গরু মোটাতাজাকরণ, ৩ টি পান চাষ, ১ টি খুচরা কারবার, ১ টি পেপার প্যাকেজিং, ৬ টি টেইলারিং এন্ড ড্রেস মেকিং, ২ টি সোলার ড্রায়ার, ৫টি উন্নত শুটকি উৎপাদন, ১ টি ড্রায়ার ফিস প্যাকেজিং, ১ টি নাপ্পি, ১ টি রিক্সা, ২ টি ফিস ফুড প্রসেসিং। এসব ব্যবসা প্রকল্প থেকে সর্বমোট ২,৬২,৮৭৩ টাকা লাভ পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত লভ্যাংশ হতে গ্রাম সংগঠনের হিসাবে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫৩,৩৭০/- টাকা ফেরত দিয়েছেন। উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রামের সকল সদস্য নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে গ্রামের অন্য সদস্যদের ঋণ হিসাবে প্রদান করতে পারবেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রতিটি গ্রামে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগ মোকাবিলা ও দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনার ওপর ব্যাপক প্রশিক্ষণ, ডেমোনেস্ট্রেশন সহ নানা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি গ্রাম সংগঠনে মৎস্যজীবীদের মধ্য থেকে একজন করে সি/এ বা চেঞ্জ এজেন্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে যারা দুর্যোগপূর্ব ও পরবর্তী সকল কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিটি সংগঠনের একটি করে তিন ব্যান্ড রেডিও, লাইফ জ্যাকেটসহ জীবন রক্ষাকারী কিছু কিছু সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় আজ তারা অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক সংগঠিত ও শক্তিশালী।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতায় সচেতনতা বৃদ্ধিসহ 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন, এফএও এর "মৎস্য আহরণের দায়িত্বশীল আচরণবিধি" ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৎস্যজীবীগণ আজ প্রকৃত অর্থে সমুদ্রের সম্পদের টেকসই আহরণ ও ব্যবস্থাপনার সুফল বুঝতে পেরেছে। তাই তারা গঠন করেছে জাল ভিত্তিক ৬ টি মাৎস্য ব্যবস্থাপনা সংগঠন, যারা উপকূলীয় সম্পদ সংরক্ষণে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। ইতোমধ্যেই মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে কয়েকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে ঃ

- সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় মৎস্যজীবীগণ লাইফ জ্যাকেট ও রেডিও সংগে নেবেন। এ ব্যাপারে মালিককে জানানো হবে। তবে ছোট একটি রশি ও ৭ টি ফ্লোট দিয়ে তৈরী স্ব-উদ্ভাবিত লাইফ জ্যাকেট প্রত্যেকে ব্যবহার করবে;
- নিজেরা চিংড়ি পোনা ধরবে না এবং অন্যকেও ধরা থেকে বিরত রাখবে;
- বেড় জালের পকেট বা কুম কেটে বাদ দিবে যাতে ছোট আকারের মাছ জাল থেকে বের হয়ে যেতে পারে;
- কারেন্ট জালের ব্যবহার সীমিত করার লক্ষ্যে এই জাল তৈরির উৎস ও মালামাল বিক্রয় বন্ধ করা হবে ;
- কল্যাণ তহবিল ও সংগঠন পরিচালনার জন্য প্রত্যেক মৎস্যজীবী মাসিক যথাক্রমে ৫ টাকা ও ১ টাকা জমা করবে । দুর্ঘটনাজনিত কারণে কারো মৃত্যু হলে বা কোন অংগহানি ঘটলে উক্ত কল্যাণ তহবিল থেকে এককালীন সাহায্য দেয়া যাবে।

ইতোমধ্যে এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এমনিভাবে প্রতিটি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে মৎস্যজীবীগণ একটি সুসংগঠিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে যারা আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় যে কোন সময়ের চেয়ে পরিণত ও শক্তিশালী।

উপসংহার

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায় একে অপরের পরিপূরক। সামুদ্রিক সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে হলে মৎস্যজীবীদেরও উন্নয়ন দরকার। মৎস্যজীবীরা সামুদ্রিক সম্পদের সাথে যুক্ত বলে একমাত্র তারাই পারে এ সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন ঘটাতে। বাইরের লোক দিয়ে সমুদ্র সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন আশা করা যায় না। একথাটি আমাদের চিন্তা, পরিকল্পনা, কর্ম ও বাস্তবায়নে স্থান দিতে হবে। সরকার সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও মৎস্য আইনের সার্বিক ও কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র আইনের প্রয়োগ ও এর বাস্তবায়নের দ্বারা এই সম্ভাবনাময় সম্পদ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। মৎস্যজীবীদের উন্নয়নকে সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর এটাই হচ্ছে উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের প্রত্যাশা।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বর্তমান সরকারের সাফল্য

(Success of Present Government in Fisheries Sector Development)

মোঃ আলি-উর-রেজা
মৎস্য অধিদপ্তর

Abstract

Bangladesh is enriched with huge water resources which are suitable for fish culture. It contributes significantly to the socio-economic development of the country. About 1.2 crore persons are directly or indirectly involved in this sector. **Shahid President Ziaur Rahman** first felt the necessity and importance of fisheries sector and declared fish culture as social movement to the nation. The present Government of Bangladesh has given special emphasis on fisheries development and already has taken different programmes to achieve annual target of 24.45 lakh ton of fish production in 2005-2006 fiscal year. Significant steps have been taken towards environmental protection, bio-diversity conservation and poverty alleviation. In the year of 2003-2004, 21.02 lakh M.T of fish production was achieved. In the year of 2004-2005, fish and fish products exported 63,377.93 M.T of value Tk. 2571.72 core in the over-since from the past.

মৎস্য সম্পদের বিভিন্ন উৎসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করাই হচ্ছে বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এই উপখাতটি বর্তমানে রপ্তানি বানিজ্যে ৫.৭১% অবদান রাখছে এবং এদেশের মানুষের প্রায় ৬৩% প্রাণিজ আমিষ যোগান দিচ্ছে। দেশের প্রায় ১.২ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ সম্পদের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে এবং এ সেক্টরে বার্ষিক শতকরা ৩.৫ ভাগ হারে শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, পুকুর-দিঘী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, নদ-নদীসহ বর্ষা মৌসুমে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মোট পরিমাণ দাড়ায় প্রায় ৪৯.৩২ লক্ষ হেক্টর। তাছাড়াও রয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল অর্থনৈতিক এলাকা। বর্তমানে মোট মৎস্য উৎপাদেনর মাত্র ২০-২২% আহরিত হচ্ছে সমুদ্র থেকে।

১৯৭৪-৭৫ সালে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল মাত্র ৭.৪০ মেট্রিক টন। মৎস্য সেক্টরের এ দূরবস্থা দেখে তৎকালীন সময়ে **শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান** এ সেক্টরটিকে একটি বিশাল সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচনা করে এর উন্নয়নের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ তাঁর শাসনামল থেকেই নবজীবনের নবধারায় শুরু হয়। মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, উৎপাদন, সহনশীল মৎস্য আহরণ এবং টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রূপালী বিপ্লব সাধনে তিনি যে সামাজিক আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, আন্দোলনের যে নবধারা সৃষ্টি করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতার ফলে বাজারে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে পরবর্তী সরকারগুলো এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের উদাসীনতা আমাদেরকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছিল। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এ সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহারের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ১৯৯০-৯১ সালে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৮.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জনসংখ্যার নিরীখে মাথাপিছু দৈনিক আমিষ গ্রহণের পরিমাণ ছিল প্রায় ২১ গ্রাম, যা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম। পরবর্তীতে মাছের উৎপাদন উন্নীত হয়ে দাঁড়ায় ২১.০২ লক্ষ মেট্রিক টন। রপ্তানি এবং আহরণোত্তর অপচয় বাদ দিয়ে বর্তমানে মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ প্রায় ৪০.০০ গ্রাম। বর্তমান সরকারের সঠিক দিক নির্দেশনায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াস, সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বর্তমান বৎসরে (২০০৪-২০০৫) এ যাবৎ কালে সর্বাধিক রপ্তানি আয় প্রায় ২৫৭১.৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা বিগত বৎসরের তুলনায় অনেক বেশি। ২০০৫-২০০৬ সালে মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৪.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বর্তমান সরকারের আরও একটি সাফল্য মানব সম্পদ উন্নয়ন। দেশের কাঙ্খিত উন্নয়নে বিশাল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করা বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এর সাথে সংগতি রেখে মৎস্য সেক্টরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে মৎস্যজীবী, মৎস্য খামার মালিক, উদ্যোক্তা, বেকার যুবক, যুব মহিলা, প্রান্তিক ও দরিদ্র মৎস্য চাষী, পোনা আহরণকারী, মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত মহিলা ও পুরুষ শ্রমিক, পেশাজীবী পুরুষ-মহিলা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সদস্যসহ অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এলক্ষ্যে সরকার মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৎস্য অধিদপ্তর উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের বিভিন্ন কর্মকর্তার মাধ্যমে ২০০৪-২০০৫ সালে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের নিমিত্তে প্রায় দশ লক্ষ মাছ চাষীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং আপামর জনসাধারণকে সচেতন করার প্রয়াসে বর্তমান সরকার প্রধান কখনো কখনো রাজধানীর কৃত্রিম পরিবেশের পরিবর্তে গ্রামীণ জনগণের মাঝে গিয়ে মৎস্য পক্ষ উদ্বোধন করেছেন। দেশব্যাপী মৎস্য চাষকে সামাজিক আন্দোলনের রূপদানও জনগনের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগানোর জন্য বর্তমান সরকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এবারে জাতীয় মৎস্য পক্ষ উদ্বোধন একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছে। বর্তমানে মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ মাছ সামুদ্রিক ক্ষেত্র থেকে আহরিত হচ্ছে। একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার সামুদ্রিক জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ। এছাড়া মোহনাঞ্চল, সুন্দরবন সংরক্ষিত জলাভূমি ও আন্তঃদেশীয় অঞ্চলের জলাভূমিসহ সর্বমোট প্রায় ২.৩৩ বর্গ কিঃ মিঃ সামুদ্রিক জলাশয় বিদ্যমান। এই বিশাল সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং সহনশীল মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বর্তমান মজুদকে স্থিতিশীল রেখে নিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণে এ সরকার সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে নির্দিষ্ট ৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মৎস্য আহরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে উক্ত এলাকাকে মৎস্য অভয়াশ্রম (Fish Park) ঘোষণা করেছে। জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্যতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সেন্ট-মার্টিন দ্বীপটির নৈসর্গিক শোভা বজায় রাখতে প্রবাল, শৈবাল, কড়ি, ঝিনুক, বাহারি রংয়ের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, সামুদ্রিক কচ্ছপসহ অন্যান্য প্রাণিদের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

মুক্তা সম্পদ

ঝিনুক চাষের মাধ্যমে মূল্যবান মুক্তা উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনসষ্টিটিউটের সাফল্য ইতোমধ্যে মুক্তা চাষিদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। আগ্রহী মুক্তা চাষিদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে মুক্তা বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

চিংড়ি সম্পদ

রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য চিংড়ি একটি অন্যতম উৎস। আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বর্তমান সরকারের আমলে এ অঞ্চলে চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, উপকূলীয় এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পূর্বের ১,৪০,০০০ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২০৩০৭১.৩৯ হেক্টর এলাকায় চিংড়ি চাষ হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গুণগতমান সম্পন্ন চিংড়ি পোনা চাষির নিকট সহজলভ্য করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। চিংড়ি পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে পূর্বের অসুবিধা কাটিয়ে বর্তমানে বিমানযোগে পোনা পরিবহন করায় পরিবহনজনিত কারণে চিংড়ি পোনা মৃত্যুর হার একেবারে কমে এসেছে। চিংড়ি শিল্পের ক্রমউন্নতির পথে এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ

সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মৎস্য চাষিদের মধ্যে সহজশর্তে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রথা চালু করেছে। এর মাধ্যমে গত অর্থ বৎসরে ২.৫ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ দেশের দরিদ্র মৎস্যচাষিদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং আগামী অর্থ বৎসরের জন্য ২০ কোটি টাকার বরাদ্দের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এ সরকার এই প্রথমবারের মত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্যচাষিদের জন্য বন্যাত্তোর পুর্নবাসন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এই কর্মসুচির আওতায় গত অর্থ বৎসরে ১০ কোটি টাকার পুর্নবাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্য চাষিদের পুর্নবাসন করা হয়।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা

জলমহাল ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত রয়েছে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী। এদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এবং জলমহালগুলোর জৈবিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য **শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান** তৎকালীন সময়ে দেশের সমস্ত জলমহালগুলো মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করেছিলেন। পরবর্তীতে সরকার তা পুনরায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত করেন। বর্তমানে ২০ একরের কম আয়তনের জলমহাল যুব অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায়; ২০ একরের বেশী আয়তনের জলাশয় ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং খুবই সীমিত সংখ্যক জলমহাল মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। দেশের এসব জলমহাল ইজারাভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে উৎপাদন ভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা করা হলে উৎপাদন অনেক গুন বৃদ্ধি হবে বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা। এরই আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন (Habitat Restoration), নির্দিষ্ট জলমহালের মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ফিসপাস নির্মাণ, প্লাবনভূমিতে পোনা মজুদ এবং অংশীদারিত্বমূলক সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এ সরকার গুরুত্ব সহকারে হাতে নিয়েছে। দেশের ২৮.৫০ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমিতে মৎস্য উৎপাদনের নিমিত্তে ব্যাপক কর্মসূচি সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের লাগসই সমাজভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

জাটকা রক্ষা কর্মসূচি

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই ইলিশ সম্পদ রক্ষার্থে জাটকা নিধন রোধ কল্পে জাটকা রক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর আওতায় জাটকা না ধরা এবং না খাওয়ার বিষয়ে জনগনকে সচেতন করার লক্ষ্যে রেডিও, টিভিতে ব্যাপক প্রচারণার পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে সচেতনতা সভা, নৌর্যালী, পোষ্টার, লিফলেট বিতরণসহ নৌবাহিনী, কোষ্টগার্ড ও পুলিশ এবং প্রশাসনের সহায়তায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, টাস্কফোর্স গঠন, ইলিশের অভয়াশ্রম স্থাপন, জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকার নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত কাজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী দিক নির্দেশনার ফলশ্রুতিতে মাননীয় শিক্ষা প্রতি মন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। জাটকা রক্ষা কর্মসূচীর আওতায় জাটকা মৌসুমে জেলেদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কর্তৃক ১ হাজার মেট্রিক টন চাউল ও ২ কোটি টাকা বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য জেলেদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য আইন বাস্তবায়নে ১.৪৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। সরকারের এ বাস্তবমূখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে গত ২০০৩-২০০৪ সালে ৫৫০০০ মেট্রিক টন ইলিশ বেশি উৎপাদন হয় যার বাজার মূল্য প্রায় ৮০০.০০ কোটি টাকা এবং এরই ধারাবাহিকতায় আগামীতে আরো চাহিদাভিত্তিক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

বিপন্ন প্রজাতির মাছ রক্ষা

বাটা, সরপুঁটি, মহাশোল, ঘনিয়া, ভাঙ্গনা, শিং, মাগুর, কৈ, গুলশা, পাবদা, খলিশা, গুজি, আইড় ইত্যাদি বিপন্ন প্রজাতির মৎস্য পোনা উৎপাদন ও আধুনিক চাষ পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করে মাঠ পর্যায়ে উদ্যোক্তা ও মৎস্যচাষিদের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্য সংরক্ষণ

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ সংশোধন করে সকল প্রকার কারেন্ট জালের আমদানি, উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা এ সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। গুণগত মানসম্পন্ন মাছের পোনা উৎপাদন ও প্রজনন ব্যবস্থা নিরসনে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধিকরণ, মৎস্য খাদ্য, মৎস্য সংঘনিরোধ আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শেষ কথা, মৎস্য সম্পদের উজ্জল সম্ভাবনা ও উন্নয়নে বর্তমান সরকার মৎস্য খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে আর্থিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা গ্রামীণ পরিসরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বর্ধিত জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়নসহ দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য এ সেক্টরে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে। দেশীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সকলের সম্পৃক্ততা ও সমন্বিত প্রয়াসই এখন আমাদের অঙ্গীকার এবং সাথে সাথে **শহীদ জিয়ার** স্বপ্ন বাস্তবায়নই হউক আমাদের একমাত্র প্রত্যয়।

ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্ভাবনা
(Use and Prospect of Cryo-preservation Technology)

ড. মোঃ ফজলুল আউয়াল মোল্লাহ
মুহাম্মদ গোলাম কাদের খান
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Cryo-preservation, a long-term storage technique of gametes has been attempted in Bangladesh in Chinese carp, Indian major carps and European carp. The technology requires temperature of liquid nitrogen (-196^{0}C) for keeping the genetic status of gamete or zygote unchanged and stable year after year. Although in many countries this technique has been executed for sperm, ova and zygote conservation, as a first-ever technique in ours, it has been initiated for spermatozoa preservation only. The procedure requires extender and cryo-protrective media to treat the sperm before putting them in liquid nitrogen through computer-based program. The effects of extender and cryo-protective media have been tested for standardizing suitable protocols of this newly evolved technology in fish gametes. The standardization of cryo-preservation protocol in spermatozoa might help farmers to rear only females and leave the space required for male brood rearing. Cryo-preservation would be an outstanding technology to protect endangered species by gene banking and to prevent unintentional inter-specific hybridization. It also allows exchange of preserved sperm among different hatchery. Preservation of gametes of threatened and cultivable species through cryo-preservation would help protecting genetic introgression and inbreeding problem. Quality seed production on need-based demand could also be assured by this technology.

ভূমিকা

বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের একটি বড় অংশ আসে চাষকৃত উৎস থেকে। চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় পোনা চাষিগণ বিগত কয়েক বছরে দ্রুতহারে গজিয়ে উঠা হ্যাচারিগুলো থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। মুক্ত জলাশয়গুলোতে পানি দূষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় এবং অতিমাত্রায় মাছ আহরণের কারণে কাঙ্ক্ষিত পোনা পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। হ্যাচারিগুলো আশানুরূপ পোনা উৎপাদন করলেও গুণগত মানের ক্রমঃঅবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া যায়, হ্যাচারিতে উৎপাদিত অধিকাংশ পোনার বৃদ্ধিহার কম, বিকলাঙ্গতা ও রোগবালাই প্রকট। এর কারণ হিসেবে অনুন্নত ব্রুড ব্যবস্থাপনা, অন্তঃপ্রজনন, ইচ্ছাকৃত/অপরিকল্পিত সংকরায়ন, ঋনাত্মক নির্বাচন (Negative selection), সর্বোপরি হ্যাচারি ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতাকে দায়ী করা যায়। হ্যাচারি মালিক ও ব্যবস্থাপকদের ইচ্ছাকৃত এই চর্চা শুধুমাত্র মৎস্য সম্পদ উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করবে তা নয়, বরং মৎস্য সম্পদের কৌলিক গুণাবলী (Genetics) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে। পাশাপাশি বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির সংখ্যাও বেড়ে যাবে অনেকগুণে। হ্যাচারি পোনার জীনগত বৈচিত্র্যের অবনতি রোধকল্পে হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন এবং একটি কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগে ডি.এফ.আই.ডি. এর অর্থায়নে ২০০৩ সাল থেকে মাছের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ প্রযুক্তি ক্রায়োপ্রিজারভেশন এর সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মাছের গ্যামেট এর উপর বাংলাদেশে এটিই প্রথম প্রকল্প। এই প্রযুক্তির সফল ব্যবহার মাছের জীনগত অবনতি রোধের পাশাপাশি অন্তঃপ্রজনন সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। উপরন্তু বিপন্নপ্রায় প্রজাতি সমূহ সংরক্ষণ এবং তাদের কৃত্রিম প্রজননে অনেকাংশে সহায়তা করবে এই ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তি। উল্লেখ্য ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত শুধু মাছের শুক্রাণুই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। কারণ শুক্রাণুর ক্রায়োপ্রিজারভেশন অপেক্ষাকৃত সহজ।

ক্রায়োপ্রিজারভেশন কী ?

ক্রায়োপ্রিজারভেশন হলো ক্রায়োবায়োলজীর এমন একটি শাখা যেখানে জীবের বিশেষ অংশকে যেমনঃ শুক্রাণু, ডিম্বাণু, ভ্রূণ ইত্যাদিকে দীর্ঘ সময় যাবৎ অত্যধিক নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও মজুদ রাখা যায়। সাধারণত তরল নাইট্রোজেনে -১৯৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই সংরক্ষণ কাজটি করা হয়। উল্লেখিত তাপমাত্রায় গ্যামেট বা ভ্রূণ সংরক্ষণ করলে এদের গুণগত মানের কোন পরিবর্তন হয় না।

ক্রায়োপ্রিজারভেশনের উপকারিতা

ক্রায়োপ্রিজারভেশনের নানাবিধ উপকারিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১। কিছু কিছু প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ মাছে একই সময়ে প্রজনন পরিপক্কতা আসে না বিধায় অনেকক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত সংকরায়ন ঘটানো হয়। শুক্রাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনমত শুক্রাণু সরবরাহ করে এই অনাকাংখিত সংকরায়ন বন্ধ করা যাবে।

২। গুণগত মান সম্পন্ন সংরক্ষিত শুক্রাণু, ডিম্বাণু এবং ভ্রূণকে খুব সহজেই বিভিন্ন হ্যাচারিতে সরবরাহ করা যাবে এবং এর মাধ্যমে অন্তঃপ্রজনন রোধ করা যাবে।

৩। শুধুমাত্র শুক্রাণুর ক্রায়োপ্রিজারভেশন করলে প্রজনন উদ্দেশ্যে পুকুরে পুরুষ মাছ লালনের প্রয়োজন হবে না। ফলে হ্যাচারিতে মাছের মজুদ ও ব্যবস্থাপনা জনিত খরচ হ্রাস পাবে। পাশাপাশি বেশী সংখ্যক স্ত্রী মাছ মজুদ করতে পারার কারণে গুণগত মান সম্পন্ন পোনা উৎপাদনও বাড়বে।

৪। বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজাতিকে জীন ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে রক্ষা করা সম্ভবপর হবে।

৫। পরিকল্পিত সংকরায়নের ফলে এই প্রযুক্তি আকাঙ্ক্ষিত ফেনোটাইপ বা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।

৬। মাছের শুক্রাণু সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তিকে আরও সহজ করা যাবে।

ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতি

বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত শুধুমাত্র শুক্রাণুর ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতির উপযোগীতা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। শুক্রাণুর ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতি সংক্ষেপে নিম্নে বর্ননা করা হলোঃ

গুণগত মানসম্পন্ন পরিপক্ক পুরুষ মাছ নির্বাচন করে প্রণোদক ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। যথাসময়ে প্লাষ্টিকের এপেনডরফ কিংবা ছোট আকৃতির টিউবে শুক্রাণু সংগ্রহ করা হয়। শুক্রাণু সংগ্রহের সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যাতে শুক্রাণুর সাথে পানি, মাছের মলমূত্র বা রক্ত না মিশতে পারে। সংগৃহীত শুক্রাণু সাথে সাথে ক্রায়োপ্রিজারভেশন করা না গেলে তা সাময়িকভাবে বরফে সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে।

ক্রায়োপ্রিজারভেশনের পূর্বে সংগৃহীত শুক্রাণু মাইক্রোস্কোপের নীচে পরীক্ষা করা হয়। শুক্রাণুর সক্রিয়তা কম পক্ষে ৫০% এর উপরে হলে তা ক্রায়োপ্রিজারভেশনের জন্য নির্বাচন করা হয়। তবে সক্রিয়তা ৭০-৮০% অথবা তার বেশী হলে উত্তম। সংগৃহীত শুক্রাণুকে অতঃপর বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের সাথে মিশিয়ে সংরক্ষণ উপযোগী কম ঘনত্বসম্পন্ন করা হয়। রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবে বিভিন্ন ধরনের এক্সটেন্ডার ও ক্রায়োপ্রটেকটেন্ট ব্যবহার করা হয়।

অতঃপর আবার মাইক্রোস্কোপে শুক্রাণুর সক্রিয়তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে শুক্রাণুর সাথে রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশানোর ফলে সক্রিয়তার কোন পরিবর্তন হয় কিনা তা বুঝা যায়।

লঘুকৃত শুক্রাণুকে মাইক্রোপিপেটের সাহায্যে স্ট্রতে ভর্তি করা হয়। স্ট্রর এক প্রান্ত তুলা দ্বারা আটকানো থাকে এবং অপর প্রান্তও বায়ুরোধী করা হয়। অতঃপর এই স্ট্র-গুলোকে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত শীতলীকরণ মেশিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পর্যায়ক্রমে-৮০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হিমায়িত করা হয়। হিমায়িতকরণ শেষে স্ট্রগুলোকে তরল নাইট্রোজেনে-১৯৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। এই অবস্থায় শুক্রাণু বছরের পর বছর বেঁচে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী এই শুক্রাণু দ্বারা মাছের ডিম নিষিক্ত করা যায়।

শুক্রাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশনের ধাপসমূহ

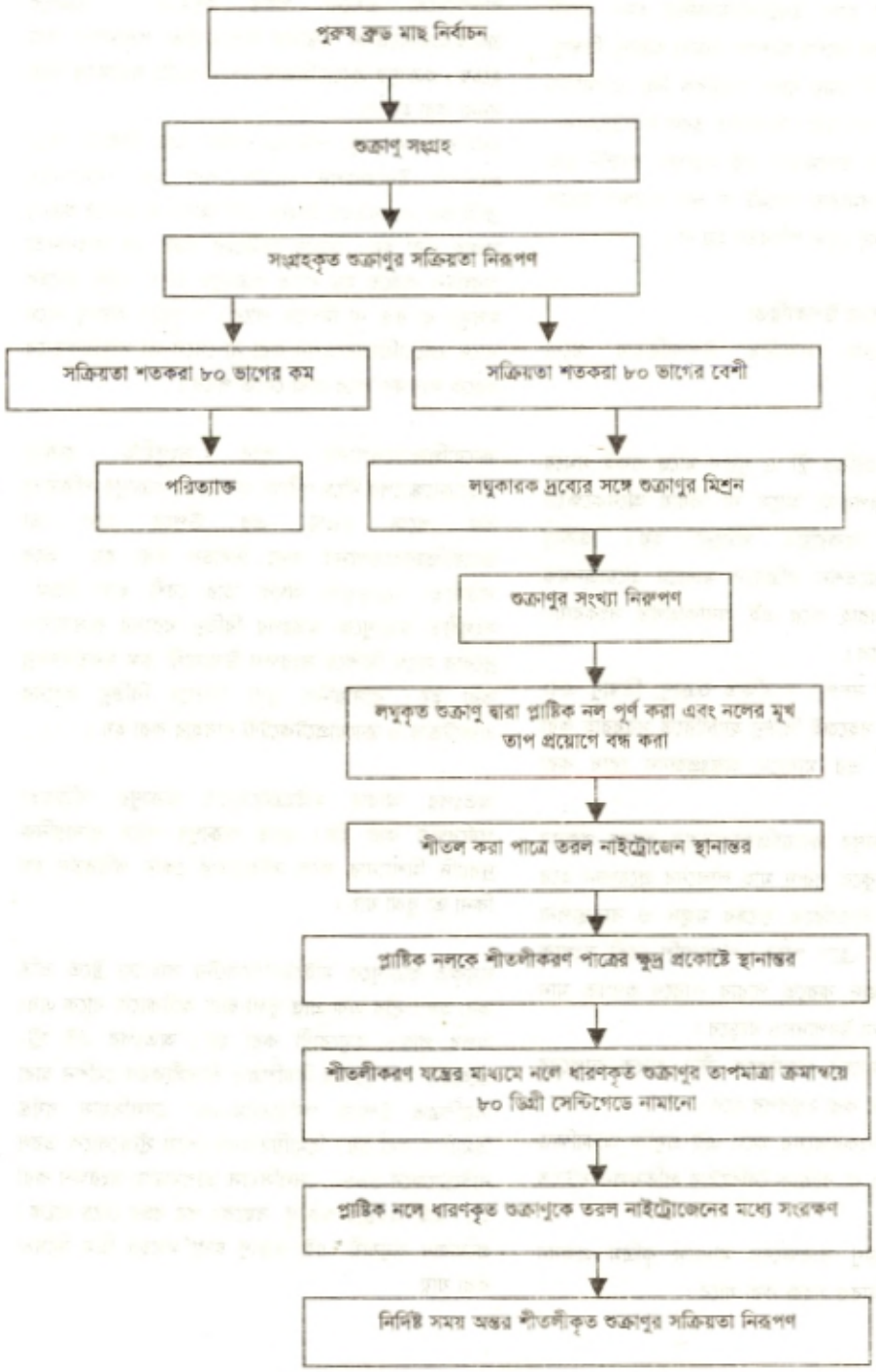

উপসংহার

ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতি অবলম্বন করে সময়মত চাহিদা উপযোগী পোনা উৎপন্ন করার পাশাপাশি মাছের বিকলাঙ্গতা, রোগ-বালাই, অন্তঃপ্রজনন, অপরিকল্পিত সংকরায়ন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমস্যার অবসান ঘটানো সম্ভব। তবে শুক্রাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশনের পদ্ধতি পৃথিবীর অনেক দেশে ইতোপূর্বে বিভিন্ন মাছের ক্ষেত্রে সফলভাবে প্রয়োগ হয়ে আসলেও বাংলাদেশে এটিই প্রথম উদ্যোগ। স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে এ পর্যন্ত সিলভার কার্প, বিগহেডকার্প, কমনকার্প, রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের শুক্রাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশনের উপযোগিতা দেখা হয়েছে। বিগহেড ও কমনকার্প মাছের ক্ষেত্রে ক্রায়োপ্রিজারভেশনকৃত শুক্রাণু দিয়ে পরিপক্ক ডিম্বাণুকে সফলভাবে নিষিক্ত করে পোনা তৈরি সম্ভবপর হয়েছে। এ ধরনের একটি জটিল প্রক্রিয়াকে মাঠ পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য স্বল্প সময়ের এ গবেষণা যথেষ্ট নয়। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে মাঠ উপযোগী করে একটি সম্প্রসারণ মডেলের মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিকট পৌছানোর প্রয়াস অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে গরু-মহিষের শুক্রাণু প্রিজারভেশন এবং মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগীদের মাঝে এর সম্প্রসারণ কাজ অত্যন্ত সফলতার সাথে চলে আসছে প্রায় দুই যুগ ধরে।

দারিদ্র বিমোচনে প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্য খাত
(Role of Aquaculture Technology in Poverty Alleviation)

ডঃ ইয়াহিয়া মাহমুদ
বিএফআরআই

Abstract

Bangladesh is fortunate enough of having a vast water resources with about 1.47 lakh hectare of ponds, 40.47 lakh hectare of flood plains, 0.054 lakh hectare of oxbow lakes and 1.41 lakh hectare of coastal farms. The production from these water bodies could be increased through scientific management and proper policy making for poverty alleviation of the rural people.

The Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI) has so far developed 36 improved aquaculture and management technologies of which some are extremely suitable for income generating and poverty alleviation. The major technologies evolved by BFRI for rural farmers are: (i) Mass seed production and cuture management of some endangered fish species viz. pabda, gulsh, gonia, bata, magur, shing and mahseer (ii) Culture of tilapia and rajpunti in seasonal pond (iii) Intergrated rice-fish farming (iv) Pond culture of pangus (v) Freshwater prawn seed production in backyard hatchery (vi) Hilsa fishery management and development (vii) Crab fattening.

The average fish production in the country was very low before adoption of technology based aquaculture and management practices. Following these interventions fish production and household income have increased in the country. To achieve the Mellenium Development Goals aquaculture sector thus needs much more national thrust for providing gainful employment and alleviting poverty of the rural people.

বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫০ ভাগ মানুষের অবস্থান দারিদ্র্য সীমার নিচে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অভাব অত্যন্ত প্রকট। তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সীমিত। এসকল দরিদ্র মানুষের আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা অতীব জরুরী।

প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের বিস্তৃত জলাশয় রয়েছে। নদী মাতৃক এই দেশে আছে নদ-নদী, খাল-বিল, হাওরসহ অসংখ্য পুকুর জলাশয়। মৎস্যচাষ ইতোমধ্যে আমাদের দেশে একটি লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছে। গ্রামীণ জনগনের পাশাপাশি অনেক বিত্তবানরাও ইদানিং মাছচাষে এগিয়ে আসছেন। উদ্যোক্তারা ধানী জমি ক্রয় করে বিশাল বিশাল মৎস্য খামার গড়ে তুলছেন। পুরুষের পাশাপাশি গ্রামীণ মহিলারাও মাছচাষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছেন। প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ তাদের নিকট অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলশ্রুতিতে শুধু রপ্তানি বাণিজ্যেই নয়, গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনেও প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ বর্তমানে একটি অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নের এই ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আমাদের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আরো পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার প্রয়োজন।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) ইতোমধ্যে জাতীয় চাহিদার নিরিখে নিবিড় গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্য প্রজনন, মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৩৬টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং পরিমার্জন করেছে । ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রধান প্রধান

পাবদা, গুলশা, গণিয়া, বাঁটা, মহাশোল, শিং ও মাগুরের পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ও মৌসুমী জলাশয়ে রাজপুটি ও তেলাপিয়ার চাষ, ধান ক্ষেতে মাছচাষ, পুকুরে পাঙ্গাস মাছের চাষ, গৃহাঙ্গন হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন, মাছের সাধারণ রোগ নির্ণয়, প্রতিকার ও ব্যবস্থাপনা কৌশল, ইলিশ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি, প্লাবনভূমির মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি, কার্কড়া ফ্যাটেনিং, ঘেরে বাগদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত কয়েকটি প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

- **বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা**

IUCN ১৯৮৯ এর সমীক্ষা এবং বিএফআরআই এর গবেষণা তথ্য অনুযায়ী দেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে বিপন্ন প্রজাতির মাছের সংখ্যা ৫৪টি। জীববৈচিত্র্যতা রক্ষাকল্পে ইনস্টিটিউট থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এসকল বিপন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে পাবদা, গুলশা, গনিয়া, বাটা ও মহাশোল মাছের পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হওয়ায় দেশে বিপন্ন জাতের মাছের পোনা প্রাপ্তি ও চাষের পথ সুগম হয়েছে। বিপন্ন প্রজাতির এসকল মাছের বাজার চাহিদা অত্যন্ত বেশি বলে চাষিরা অধিক মুনাফা অর্জন করছে। পাশাপাশি বিপন্ন জাতের এসব মাছের জীনপুল সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।

- **গৃহাঙ্গন হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন**

প্রাকৃতিক উৎস হতে গলদা চিংড়ির পোনা প্রাপ্তির নির্ভরশীলতা কমিয়ে কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন করার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট অল্প খরচে প্রান্তিক চাষিদের ব্যবহার উপযোগী গৃহাঙ্গন হ্যাচরি উদ্ভাবন করেছে। সিমেন্টের ট্যাংক, চাড়ি, ড্রাম বা প্লাষ্টিকের ট্যাংকে প্রতি ঘনমিটারে ১০০০ পিএলকে শুধুমাত্র জুপ্লাংটন খাদ্য হিসেবে প্রয়োগের মাধ্যমে ১ মাসে চাষ উপযোগী জুভেনাইল-এ রূপান্তর করা যায়। এ পদ্ধতিতে জুভেনাইল বাঁচার হার শতকরা ৯০ ভাগ। মিঠাপানি এলাকায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করে ৩৫-৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে এক মৌসুমে প্রায় ১ লক্ষ পিএল উৎপাদন করা যায়- যা থেকে একজন চাষি লক্ষাধিক টাকা আয় করতে পারে।

- **রাজপুঁটি চাষ**

দেশের ক্ষুদ্র ও মৌসুমী জলাশয়ে স্বল্প সময়ে দ্রুত বর্ধনশীল রাজপুঁটি চাষের উপর ইনস্টিটিউট থেকে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। গ্রামীণ চাষিরা তাদের বাড়ীর আঙ্গিনার পুকুরে প্রতি একরে ৭-১০ গ্রাম ওজনের ৬০০০-৬৫০০টি রাজপুঁটির পোনা মজুদ করে শুধুমাত্র চালের কুড়া প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি ৫ মাসে একর প্রতি ১০০০ কেজি পর্যন্ত ফলন পেতে পারে। এতে একজন চাষি ৫ মাসে একর প্রতি ২৫- ৩০ হাজার টাকা নীট মুনাফা অর্জন করতে পারে। ময়মনসিংহের ত্রিশাল অঞ্চলে রাজপুঁটি চাষের অনেক সফল গৌরব গাঁথা রয়েছে। এ ধরণের কর্মকান্ডে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান এবং অংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- **তেলাপিয়া চাষ**

গ্রামীণ মৎসচাষের ক্ষেত্রে মনোসেক্স তেলাপিয়া সাম্প্রতিককালে একটি সম্ভাবনাময় মাছের জাত হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। সকল ক্ষুদ্র ও মৌসুমী পুকুরে সহজেই এ মাছের চাষ করা যায়। অন্যান্য জাতের তেলাপিয়ার ন্যায় এটি পুকুরে কোন বাচ্চা দেয় না এবং অন্যদের দৈহিক বৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্থ করে না। সহজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তেলাপিয়ার মোট ওজনের ৫-৬ ভাগ হারে চালের কুড়া প্রয়োগ করে ৬ মাসে একর প্রতি ৩৫-৩৬ হাজার টাকা নীট মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

- **ধানক্ষেতে মাছ চাষ**

আমাদের দেশে ২৬.৭ মিলিয়ন একরেরও বেশি ধান ক্ষেতে সমন্বিত উপায়ে ধানের সাথে মাছ চাষ করা সম্ভব। বর্ষাকালীন আমন ও বোরো ধান চাষের সময় এধরণের সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ রাজপুঁটি, মিরর কার্প, কার্পিও কিংবা তেলাপিয়া মাছকে প্রাধান্য দেয়া হয়। মিঠাপানির গলদা চিংড়িও একই সময়ে চাষ করা যেতে পারে। এধরণের সমন্বিত চাষের ফলে আমন ও বোরো মৌসুমে যথাক্রমে একর প্রতি ১২০ এবং ১৪৫ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এতে করে একজন কৃষক আমন ও বোরো মৌসুমে মাছ বিক্রয় করে গড়ে প্রায় ৩৫০০ এবং ৪৫০০ টাকা নীট আয় করতে পারে। অথচ শুধুমাত্র ধানচাষ করে যথাক্রমে ১৬০০ এবং ২০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করা যায়।

- **পুকুরে পাঙ্গাস মাছের চাষ**

ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নব্বই দশকের শেষের দিকে পাঙ্গাস চাষের যাত্রা শুরু হলেও এর প্রসারতা এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তিতে জলজ পরিবেশকে সহনশীল পর্যায় রেখে ৭/৮ টন মাছ উৎপাদনের পরামর্শ দেয়া হলেও চাষিরা এখন অনেকটা অগ্রসর। তাঁরা এখন একরে ৪০ টন পর্যন্ত পাঙ্গাস উৎপাদন করছে। এতে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটলেও সার্বিকভাবে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ময়মনসিংহের ত্রিশাল, গফরগাঁও, ফুলবাড়িয়া, গৌরিপুর ও মুক্তাগাছা এবং বগুড়ার সান্তাহার এলাকায় পাঙ্গাস চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগনের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে চাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।

- **প্লাবনভূমির মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি**

প্লাবনভূমিতে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট থেকে দীর্ঘদিন গবেষণা করে বিলে পোনার মজুদ ঘনত্ব, প্রজাতি বাছাই এবং এদের আনুপাতিক হার সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও প্লাবনভূমিতে কোন মৌসুমে কি কি মাছ ধরা যাবে না এবং কোন ধরণের মাছ ধরার যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগের ফলে প্লাবনভূমিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে । এতে প্লাবনভূমির আশেপাশে বসবাসকারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- **ইলিশ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি**

একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশ বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ২৫ ভাগ ইলিশের অবদান। তাই ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণকল্পে ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন যাবত গবেষণা করে এর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছে। গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ইলিশ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন প্রণীত হয়েছে। নভেম্বর - মে মাস পর্যন্ত ঝাটকা নিধন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া মার্চ - এপ্রিল এই দুই মাস নিম্ন মেঘনার ৪টি প্রধান অঞ্চলকে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ইলিশ উৎপাদন ২৮% (৫৬ হাজার মেঃ টন) বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় আয়, আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **কাকঁড়া ফ্যাটেনিং**

রপ্তানীযোগ্য কাঁকড়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ইনস্টিটিউট থেকে ফ্যাটেনিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই প্রযুক্তিতে স্ত্রী কাঁকড়াকে ২ থেকে ৪ সপ্তাহ ঘেরে লালন-পালন করে এগুলোকে পরিপক্ক করা হয় অর্থাৎ গোনাড পরিপুষ্ট করা হয় এবং বাজারজাতকরণের উপযোগী করে তোলা হয়। পরিপুষ্ট গোনাড বিশিষ্ট কাঁকড়ার উচ্চ বাজার মূল্য থাকায় বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে কাকঁড়া ফ্যাটেনিং ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এতে চাষিরা লাভবান হচ্ছে।

- **ঘেরে বাগদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা**

বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ঘেরে বাগদা চিংড়ি চাষের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। এপ্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট থেকে উপকূলীয় অঞ্চলের ঘেরে বিজ্ঞানভিত্তিক আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই প্রযুক্তিতে ঘেরে পর্যাপ্ত বায়ু সঞ্চালনসহ নির্দিষ্ট মাত্রায় সার ও খাবার প্রয়োগ করা হলে হেক্টর প্রতি ২০০০-২৫০০ কেজি পর্যন্ত উৎপাদন সম্ভব। এতে জলজ পরিবেশের বিপর্যয় ঘটেনা। চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাগদা চিংড়ির আধা-নিবিড় চাষ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উপকূলীয় অঞ্চলে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এসব পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় গ্রামীণ পর্যায়ে মৎস্যচাষ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষের উপর মানুষের আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে নতুন নতুন চাষি সৃষ্টি হচ্ছে। এতে দেশে মাছের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্যানুসারে দেখা যায় যে, ১৯৮৩-৮৪ সালে উন্মুক্ত এবং বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১.৭৬ এবং ৮.৪৫%। উদ্ভাবিত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ফলে প্রবৃদ্ধির হার বর্তমানে যথাক্রমে ৩.৫৯ এবং ২৪.০০% - যা পূর্বের তুলনায় প্রায় তিন গুণ। প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হওয়ায় বিগত বছরগুলোতে মৎস্য খাতে গড়ে বাৎসরিক ১০% হারে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কর্মসংস্থান ৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। চিংড়ি খাতে রপ্তানি আয় গত পাঁচ বছরে ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষির অন্য কোন খাতে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানে এতবেশি সাফল্য অর্জিত হয়নি।

এতদসত্ত্বেও, দেশের বিস্তৃত জলাশয়ের উৎপাদন সম্ভাবনা থেকে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছি। ফসলের জমিতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ, অন্তঃপ্রজনন সমস্যার কারণে হ্যাচারি পোনার উৎপাদনশীলতা হ্রাস, চিংড়ি খাতে ব্যাপক ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব, রপ্তানিকৃত চিংড়িতে ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত এন্টিবায়োটিক যেমন নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল ও টেট্রাসাইক্লিন এর উপস্থিতি আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। সেইসাথে দেশের মাছের উৎপাদন আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় ও অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পূর্ণ অপ্রচলিত মৎস্য প্রজাতির প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বহুমুখী মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করতে হবে। বিপন্ন প্রজাতির মাছ যথা আইড়, গুজি, শোল, কৈ, বাইম ইত্যাদি মাছের চাষ ও প্রজাতিভিত্তিক স্বল্পমূল্যের খাদ্য উৎপাদনে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট এবং সমন্বিত গবেষণার মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি যেমন-চিত্রা, তাপসী, রেখা, ফ্যাসা, বাঘা কাইন মাগুর, ভোলা ও কাকচিলসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় প্রজাতি সংরক্ষণে গবেষণা জোরদার করতে হবে। এসব বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ ও চাষ করা সম্ভব হলে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে চাষিদের অপুষ্টি দূর করা সম্ভব হবে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যাবে।

উপসংহার

মৎস্য খাত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে সম্ভাবনায় ও শক্তিশালী খাত। Millenium Development Goals (MDGs) অর্জনে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রে (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP) মৎস্য খাতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করতে হলে মৎস্য খাতকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর খাতে পরিণত করতে হবে। বিগত ২৮ জুন ২০০৫ তারিখে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত "Fisheries Research Review and Vision 2015" শীর্ষক কর্মশালায় বিজ্ঞানীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষ এবং উন্মুক্ত জলাশয়কে সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা সম্ভব হলে আগামী ১০ বছরে দেশে মাছের উৎপাদন ৩ গুণবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এতে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোকের নতুন কর্মসংস্থান হবে। দেশীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের জন্য তাই প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্য খাতই হবে আগামী দিনের অন্যতম হাতিয়ার।

লেখক বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন বিজ্ঞানী

হোয়াইট স্পট সিন্ড্রোম ভাইরাস রোগমুক্ত বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনে সমস্যা ও সুপারিশ

(Problems and recommendations on the production of WSSV free black tiger shrimp fry)

মাহমুদুল করিম
বাংলাদেশ শ্রিম্প এ্যান্ড ফিশ ফাউন্ডেশন

Abstract

Since 1994, WSSV has been a cause of farmed shrimp mortality and huge economic losses to the farmers every year. PCR tests may effectively screen out WSSV infected brood shrimp and fry. The tests take 8-10 hours and are expensive and so not quite suitable for field use. For the last several years, the hatchery production of fry far exceeds the market demand with the resultant huge oversupply, excessive price falls and unhealthy competitions for fry sell, often on non-commercial deals. This situation is not conducive to production of value added virus free fry. However, farmers may be interested to buy quality fry even at a higher price if they clearly see its benefits in terms of shrimp production increase and significantly higher profit. The following major recommendations were made: i) Apprise hatchery owners about the current demand of the tiger shrimp fry, (ii) Strongly discourage unplanned productions of fry, establishment of any new hatchery or capacity expansion of the existing hatcheries until optimum utilization of the existing ones, (iii) Establish convincing demonstrations of safer and higher production and higher profit in each potential upazila by combining use of virus free fry and appropriate farming technologies, (iv) Hatcheries, either individually or in groups, should own and operate PCR test facilities and certify their PL as WSSV free, (v) The hatchery operators, farmers and processors should enter contractual systems among themselves for farming of PCR screened fry applying appropriate modern farming technologies, (vi) Establish a Committee to identify WSSV related issues as they surface from time to time and recommend practical solutions on a continuous basis, (vii) Explore suitable field kits or equipment for at least preliminary WSSV screening of brood shrimp, fry and farmed shrimp at field levels.

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক মত বিনিময় ও সহযোগিতা তথা পাবলিক-প্রাইভেট সেক্টর পার্টনারশীপের মাধ্যমে কাজ করলে উন্নয়ন ক্ষেত্রের অনেক সমস্যা সহজে চিহ্নিত ও নিরসন এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে - এই দর্শন ও নীতিতে বাংলাদেশ শ্রিম্প এ্যান্ড ফিশ ফাউন্ডেশন (বি.এস.এফ.এফ.) গভীরভাবে বিশ্বাস করে। এ নীতি অনুসরণ করে মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড্স এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বি.এফ.এফ.ই.এ.) এবং বাংলাদেশ শ্রিম্প ডেভেলপমেন্ট এ্যালায়েন্স (বি.এস.ডি.এ.)-এর সঙ্গে সমবেতভাবে বি.এস.এফ.এফ. গত ১৫ই জানুয়ারী একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল, "হোয়াইট স্পট সিন্ড্রোম ভাইরাস রোগ মুক্ত বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনে সমস্যা ও সুপারিশ "। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব লিখিতভাবে আলোচ্য বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সিঙ্গাপুর ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটির জনৈক পি.এইচ.ডি. ছাত্র ছাড়াও বি.এস.ডি.এ., বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং বাংলাদেশ শ্রিম্প হ্যাচারী এ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান প্রবন্ধসমূহ পাওয়ার-পয়েন্ট আকারে এই সভায় উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত বিষয়গুলোর তালিকা নিচে দেওয়া হল:

১. Asymptomatic carrier of white spot syndrome virus - M. Sorowar Hossain, Ph. D. student, National University of Singapore

২. A list of essential issues and policy recommendations on WSSV-free Bagda

brood-stock supply to hatcheries - Nizam M. Selim, Managing Director, Pioneer Hatchery, Cox's Bazar

৩. Some specific management issues and policy recommendations on Bagda shrimp hatchery – Dr. Shahadat Hossain, Bangladesh Fisheries Research Institute

৪. A set of burning issues and recommendations to sustain marine shrimp hatcheries –Lutfur Rahman, President, Shrimp Hatchery Association of Bangladesh (SHAB)

বর্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত তথ্যাদি মূলত উপরোক্ত উপস্থাপনাগুলি থেকে সংগৃহীত।

১৯৯০ দশক থেকে হোয়াইট স্পট সিন্ড্রোম ভাইরাস (WSSV) জনিত রোগের নাম চিংড়ি জগতে সবার মুখে মুখে। সংক্ষেপে এ জীবাণু হোয়াইট স্পট ভাইরাস এবং এর দ্বারা সৃষ্ট রোগ "হোয়াইট স্পট রোগ" নামে পরিচিত। দেখতে এ ভাইরাস লেজযুক্ত লম্বা ডিমের মত; আকার ১৪০ X ২৮০ ন্যানোমিটার (১ মিলিমিটার = ১,০০০ মাইক্রোমিটার, ১ মাইক্রোমিটার = ১,০০০ ন্যানোমিটার) যা যাবতীয় ভাইরাসের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। হোয়াইট স্পট রোগ খামারে একবার দেখা দিয়েছে তো কয়েক দিনের মধ্যেই সব চিংড়ি শেষ। খামারে সামুদ্রিক চিংড়ির ব্যাপক মৃত্যু ঘটিয়ে পৃথিবীব্যাপী এ রোগ বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়েছে। ১৯৯৩ সালে এ রোগের কারণে একমাত্র চীন দেশেই চিংড়ি শিল্পে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার পরিমাণ অন্তত ১০০ কোটি ইউ.এস.ডলার। বাংলাদেশে মড়ক আকারে এ রোগ প্রথম দেখা দেয় ১৯৯৪ সালে। বিদেশ থেকে রোগ সংক্রমিত চিংড়ি পোনা আমদানির মাধ্যমে এ রোগ বাংলাদেশে ছড়িয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সদ্য গড়ে ওঠা আধা-নিবিড়

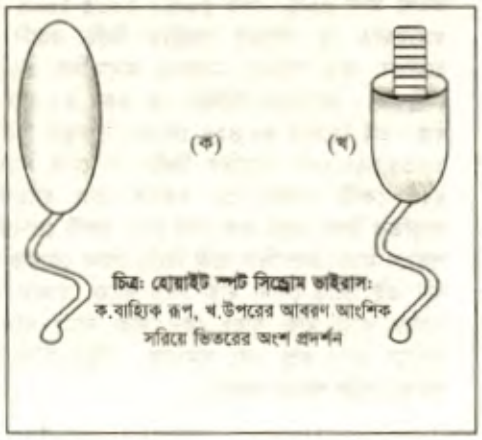

চিত্রঃ হোয়াইট স্পট সিন্ড্রোম ভাইরাসঃ ক.বাহ্যিক রূপ, খ.উপরের আবরণ আংশিক সরিয়ে ভিতরের অংশ প্রদর্শন

বাগদা চিংড়ি খামারগুলোকে সর্বনাশা এ রোগ অল্প কিছুকালের মধ্যে সর্বশান্ত করে দিয়েছিল। সেই থেকে এরোগ প্রতি বছর চিংড়ি শিল্পে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতি ঘটিয়ে আসছে এবং চিংড়ি শিল্প বিকাশের পথে বড় অন্তরায়। সামুদ্রিক ক্রাস্টেশিয়া, যেমন চিংড়ি, কাঁকড়া, স্কুইলা, জুওপ্লাঙ্কটন, ইত্যাদি সামুদ্রিক প্রাণী এ রোগের বাহক। তবে এ ভাইরাস মানুষের মধ্যে কোন রোগ সৃষ্টি করে না। উল্লেখ্য যে, চিংড়ির গায়ে সাদা স্পট বা ফোটা দেখলেই বলা যাবে না যে, এটা ভাইরাসজনিত রোগ। ব্যাকটেরিয়াল হোয়াইট স্পট সিন্ড্রোম রোগেও চিংড়ির গায়ে সাদা ফোটা সৃষ্টি হতে পারে।

সুপ্ত ও সক্রিয় অবস্থা

খামার, নদী বা সাগরের পানিতে হোয়াইট স্পট ভাইরাস অল্প-বিস্তর বিদ্যমান, এবং তা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। চিংড়ির শরীরের উপরেও সুপ্ত অবস্থায় (latent stage) ভাইরাস লেগে থাকতে পারে। গায়ে ভাইরাস লেগে থাকলেই যে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হবে, তা মোটেও ঠিক নয়। কোন কারণে, যেমন পরিবেশের মধ্যে কোন পীড়ণ (stress) সৃষ্টি হলে, সুপ্ত ভাইরাস সক্রিয় ও সংক্রমণমুখী (infective stage) হয়ে পড়ে এবং তখনই কেবল এ ভাইরাস দেহের কোষের মধ্যে ঢুকে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়।

রোগের নিরাময় বা প্রতিষেধক ঔষধাদি

কারও কারও মুখে হোয়াইট স্পট ভাইরাস রোগের নিরাময় এবং প্রতিষেধক ঔষধাদির কথা শোনা যায়, কিন্তু দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞদের সংগে কথা বলে জানা যায় যে, ভাইরাস রোগ সারিয়ে তুলতে পারে অথবা প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোন ওষুধ চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

হ্যাচারিতে রোগের সম্ভাব্য উৎসঃ

- ভাইরাসযুক্ত ব্রুডস্টক চিংড়ি (পোনা তৈরি করার জন্য যে চিংড়ি হ্যাচারিতে ব্যবহার করা হয়), পোনা অথবা সংক্রমিত পোনা পরিবহণ পাত্র
- ভাইরাসযুক্ত ক্রাস্টেসিয়া জাতীয় প্রাণী, যেমন কাঁকড়া, স্কুইলা, জুওপ্লাঙ্কটন, ইনসেক্ট লার্ভা, পলিকীট ওয়ার্ম, সমুদ্র থেকে সংগৃহীত পানি, ইত্যাদি
- পাখীর বিষ্ঠা (পাখীর পুষ্টিতন্ত্রে এ ভাইরাস বেঁচে থাকতে পারে)
- চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যপদার্থ
- চিংড়ি ও কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী অথবা তাদের দেহের অংশবিশেষ সিদ্ধ না করে চিংড়ি হ্যাচারিতে খাদ্য হিসেবে পরিবেশন
- হ্যাচারিতে ব্যবহার্য ভাইরাস সংক্রমিত সামুদ্রিক পানি

ভাইরাস শনাক্তকরণ

পি.সি.আর. (PCR) ল্যাবের সাহায্যে হোয়াইট স্পট ভাইরাস শণাক্ত করা যায়। পি.সি.আর. পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে ব্রুডস্টক সংগ্রহকারী, হ্যাচারি পরিচালক এবং চাষিরা সংক্রমিত চিংড়ি বাতিল করে ভাইরাসমুক্ত ব্রুড চিংড়ি এবং পোনা নির্বাচন করতে পারে। চিংড়ির হোয়াইট স্পট ভাইরাস পরীক্ষার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশে মাত্র দুটো পি.সি.আর ল্যাব আছে। দুটো মেশিনই কক্সবাজারে স্থাপিত। বিশেষজ্ঞ মতে বাংলাদেশে সমুদ্র থেকে সংগৃহীত ব্রুড চিংড়ির একটা বড় অংশই ভাইরাস সংক্রমিত। জুন-জুলাই মাসে, সংক্রমণের শতকরা হার খুব বেশি বলে জানা যায়। তবে তাঁদের মন্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দরকার বেশি সংখ্যক স্যাম্পল পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা। মনে রাখা দরকার, পি.সি.আর. ল্যাবে ভাইরাস পরীক্ষা করে নির্ভুল ফল পেতে হলে হরেক রকম বৈজ্ঞানিক নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হয়, নচেৎ, সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। পি.সি.আর. যন্ত্র এবং তার পরিচালনা খুব ব্যয়বহুল। এই যন্ত্র দিয়ে ভাইরাস শনাক্ত করতে ৮-৯ ঘন্টা লাগে। তাই, এই যন্ত্র দিয়ে মাঠ পর্যায়ে দ্রুত যাচাই করে ব্রুড চিংড়ি সংগ্রহ করা কিংবা পোনা ক্রয় করা সম্ভব নয়। দূর সমুদ্রে গিয়ে ট্রল নেট দিয়ে জাহাজে উঠিয়েই ব্রুড চিংড়ি তাৎক্ষণিকভাবে এবং খুব কম খরচে পরীক্ষা করে যদি ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি বেছে নেওয়া যেত, তাহলে হ্যাচারি শিল্পের খুব উপকার হত। একইভাবে, চাষিরা পোনা কেনার সময় যাচাই করে পোনা কিনতে পারলে তা হত চাষিদের জন্য বিরাট উপকার। এ জন্য উপযুক্ত কোন কীট্ বা যন্ত্রপাতি উন্নত বিশ্বে পাওয়া যায় কিনা তার অনুসন্ধান করা একান্ত জরুরী। ইদানিং, জাপানীরা এক রকম কীট বাজারজাত করতে চেষ্টা করছে। খুব কম মূল্যের এই কীট দিয়ে ২০-২৫ মিনিটের মধ্যেই ভাইরাস পরীক্ষা শেষ করা যায়। পরীক্ষার ফলাফল ফার্ষ্ট ষ্টেজ পি.সি.আর.- এর ফলাফলের সঙ্গে তুলনীয় বলে জাপানী কোম্পানী জানিয়েছে। তাদের এই তথ্য কতটুকু সঠিক তা নির্ভরযোগ্য পি.সি.আর টেষ্টের ফলাফলের সাথে সতর্কতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন। এ রকম পরীক্ষা-নীরিক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হলে দ্রুত এবং কম খরচে মাঠ পর্যায়ে হোয়াই স্পট ভাইরাস শণাক্ত করার পথ সুগম হবে। অতি সম্প্রতি বি.এস.এফ.এফ এবং বি.এস.ডি.এ. যৌথভাবে একটি জাপানী কীট্ দিয়ে মাঠ পর্যায়ে চিংড়িতে হোয়াইট স্পট ভাইরাস শণাক্তকরণের উপর সীমিত আকারে কিছু পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছিল। তখন চাষিদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই পরীক্ষা-নীরিক্ষা পি.সি.আর. ল্যাবরেটরীর সঙ্গে সমন্বয় করে একটু বেশি পরিসরে করতে পারলে উল্লেখিত ফিল্ড কীটের ফল কতটা নির্ভরযোগ্য তা পরিস্কার বোঝা যাবে। চিংড়ি শিল্পের স্বার্থে এরকম পরীক্ষা-নীরিক্ষা জরুরীভিত্তিতে করা খুবই দরকার।

প্রয়োজনের তুলনায় বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন

সামুদ্রিক চিংড়ি পোনা উৎপাদন ক্ষেত্রে বর্তমানে একটা বড় সমস্যা হল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক পোনা উৎপাদন। হ্যাচারির মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ২০০৪ সালে হ্যাচারিতে মোট ৭০০ কোটি তৈরি হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের পোনা ব্যবসায়ী এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মতে, একই বছরে প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনার পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫০ কোটি। অতএব, মোট পোনার সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫০ কোটি। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সামুদ্রিক চিংড়ি উৎপাদন খামারের পরিমাণ ১৭০,০০০ হেক্টর। বাংলাদেশে প্রতি হেক্টর সামুদ্রিক চিংড়ি খামারে মজুদের গড় হার ২৫,০০০ পোনা বলে তথ্য মেলে। এই হিসেবে মোট ১৭০,০০০ হেক্টরে মজুদের মোট পরিমাণ ৪,২৫০,০০০,০০০ বা ৪২৫ কোটি পোনা। এর সঙ্গে ১০% পরিবহন মৃত্যু বাস্তবসম্মত বলে বিবেচনা করলে খামারে মজুদের জন্য প্রয়োজনীয় পোনার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭২ কোটি। এই হিসেবে ২০০৪ সালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোনার পরিমাণ ছিল ৩৭৮ কোটি। একদিকে, বিশাল উদ্বৃত্ত, অন্যদিকে প্রতি বছর নতুন আরও বাগদা চিংড়ির হ্যাচারী স্থাপন করা হচ্ছে। বর্তমানে অন্তত ৫৫টি হ্যাচারি বিদ্যমান। প্রশ্ন হল, এত বেশি পোনা উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও হ্যাচারি ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ করা কি যৌক্তিক?

কী পরিমাণ পোনা বাজারযোগ্য চিংড়িতে রূপান্তরিত হয়?

২০০৩-২০০৪ সালে খামারে উৎপাদিত যে চিংড়ি রপ্তানি করা হয়েছিল তার পরিমাণ মাথা বাদে ৩০,৯২৫ মেট্রিক টন। এই পরিমাণের মধ্যে ২৬,২৭৬ মেট্রিকটন ছিল সামুদ্রিক চিংড়ি। বাকি ৪,৬৩৯ মেট্রিক টন মিষ্টি পানির চিংড়ি। সামুদ্রিক চিংড়ির দেহের ওজনের ৬৫% লেজের অংশ, ৩৫% মাথার অংশ। মিষ্টি পানির চিংড়ির ক্ষেত্রে অবশ্য মাথা ৫০%, লেজ ৫০%। ২০০৩-২০০৪ সালে খামারজাত যে পরিমাণ সামুদ্রিক চিংড়ি রপ্তানি করা হয়েছিল, তার পরিমাণ মাথাসহ আনুমানিক ৪০,৪২৪ মেট্রিকটন। রপ্তানিকৃত চিংড়ির গড় ওজন ৪০ গ্রাম ধরা যায়। এই হিসেবে ৪০,৪২৪ মে:টন: মাথাযুক্ত চিংড়ি = ১,৬১৬,৯৬০,০০০ সামুদ্রিক চিংড়ি, যা মোট মজুদকৃত ৪২৫ কোটি পোনার ৩৮ শতাংশ এবং হ্যাচারি ও প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত মোট ৮৫০ কোটি পোনার ১৯ শতাংশ মাত্র। উৎপাদিত বাকী চিংড়ি পোনা কোথায় যায়? যদি এই চিংড়ি পোনা মারা গিয়ে থাকে, তাহলে কোন পর্যায়ে তারা মারা যায়? কেন মারা যায়? গবেষণার মাধ্যমে এসব প্রশ্ন এবং সমস্যার সঠিক উত্তর এবং সমাধান খুঁজে পাওয়া দরকার।

প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক পোনা উৎপাদনের পরিনতি:

- অহেতুক অতিরিক্ত ব্রুড চিংড়ি সংগ্রহ; এর ফলে সাগরে ব্রুড চিংড়ির পরিমান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ব্রুড চিংড়ির দামও বেড়ে চলেছে
- অহেতুক এবং অধিক সংখ্যক ব্রুড চিংড়ি সমুদ্র থেকে অপসারণ করার ফলে সমুদ্রে প্রাকৃতিক চিংড়ির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে
- পোনা বিক্রির জন্য হ্যাচারিগুলোর মধ্যে নীতিহীন প্রতিযোগিতা ও তার ফলে পোনার অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাস
- উৎপাদনকারীরা অতিরিক্ত কম দামে এবং এমনকি প্রায়ই ১০০ ভাগ পোনা বাকীতে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে
- পোনার গুণগত মানে অনিবার্যভাবে অবনতি ঘটছে
- হ্যাচারি শিল্প রুগ্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে
- এমতাবস্থায়, ব্যয়বহুল যন্ত্রাদির মাধ্যমে যাচাই করে রোগমুক্ত পোনা উৎপাদনে হ্যাচারি পরিচালকদের মধ্যে কোন প্রেরণাই সৃষ্টি হচ্ছে না

পি.সি.আর. পরীক্ষিত বেশি দামের পোনা চাষিরা কেন ব্যবহার করবে?

- অত্যধিক উৎপাদনের কারণে হ্যাচারিজাত পোনার উদ্বৃত্ত সরবরাহ এবং দামও খুব কম। পি.সি.আর. পরীক্ষা মানেই হল বাড়তি খরচ। বেশি দাম দিয়ে চাষিরা পোনা কিনতে আগ্রহী হবে না বলে হ্যাচারি মালিকদের আশংকা। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আংশকা ন্যায়সঙ্গত
- পি.সি.আর.পরীক্ষিত বেশি দামের পোনা কিনতে চাষিরা আগ্রহী হবে তখনই, যখন তারা দেখবে যে এই পোনা ব্যবহার করলে বেশি উৎপাদন ও বেশি আর্থিক লাভ পাওয়া যায়

পি.সি.আর. পরীক্ষিত রোগমুক্ত পোনা ব্যবহার করলেই কী উৎপাদন বাড়বে?

- শুধু রোগমুক্ত পোনা ব্যবহার করলেই যে উৎপাদন বাড়বে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই
- সনাতনী খামারে সনাতনী পদ্ধতিতে চাষ করলে রোগমুক্ত পোনার উপকার পাওয়ার কোন কারণ নেই
- রোগমুক্ত পোনা উন্নত চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহার করলেই কেবল উৎপাদন বাড়তে পারে
- বিভিন্ন উৎসের ভাল-মন্দ পোনা মিশ্রিত করে চাষ করলে রোগমুক্ত পোনার গুণ পাওয়া যাবে না

রোগমুক্ত পোনা ব্যবহার করার জন্য চাষিদের উৎসাহিত করার উপায়

"রোগমুক্ত পোনা চাষ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়"-এ কথা চাষিদের কাছে হাজার বার বললেও তেমন কাজ হবে না। উপযুক্ত চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগমুক্ত পোনা ব্যবহার করে যে বেশি উৎপাদন এবং বেশি আর্থিক লাভ পাওয়া যায়, তা চাষিদের বাস্তবে দেখাতে হবে। ভাইরাসমুক্ত পোনা এবং ভাল চাষ পদ্ধতি সমন্বিতভাবে ব্যবহার করলে যে অনেক উপকার পাওয়া যায়, তা চাষিরা যখন নিজেদের চোখে দেখবে, তখনই কেবল তারা বেশি দাম দিয়ে ভাইরাসমুক্ত পোনা কিনতে আগ্রহী হবে। প্রদর্শনীর মাধ্যমে আর্কষনীয় উৎপাদন এবং লাভের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করার পর, চাষিরা যখন ভাইরাসমুক্ত পোনা কিনতে আগ্রহ দেখাবে, তখন চাষি এবং হ্যাচারি মালিকদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়া দরকার। চাষিদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট এবং বড় আকারের বায়না নিয়মিতভাবে পেলেই কেবল হ্যাচারি মালিকরা বেশী খরচ করে ভাইরাসমুক্ত পোনা উৎপাদন করতে আগ্রহী হবে।

ভাইরাস পরীক্ষিত পোনা উৎপাদনে হ্যাচারি মালিকদের উৎসাহিত করার উপায়

- রোগমুক্ত পোনার জন্য চাষিদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে বড় আকারের অর্ডার বা বায়না পেলে
- চাষি অথবা পোনা ক্রেতারা পি.সি.আর.পরীক্ষিত পোনার জন্য উপযুক্ত দাম নগদে পরিশোধ করবে
- চাষিরা কোন মিড্‌লম্যানদের উপর নির্ভর না করে নিজেরা দেখেশুনে সরাসরি হ্যাচারি থেকে পি.সি.আর. পরীক্ষিত পোনা কিনবে যেন তারা না ঠকে

সুপারিশ

- চিংড়ি পোনার সঠিক চাহিদা নিরূপণ করে এই তথ্য হ্যাচারি পরিচালকদের কাছে সরবরাহ করতে হবে যেন তারা চাহিদা মোতাবেক পোনা উৎপাদন করে; অত্যধিক পরিমাণ পোনা উৎপাদনে হ্যাচারি মালিকদের নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- বর্তমান হ্যাচারিগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা সদ্ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন হ্যাচারি প্রতিষ্ঠা অথবা বিদ্যমান কোন হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সরকারি কোন সহায়তা দেওয়া যাবে না।
- প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ বন্ধ করার ঘোষিত আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
- পরিমাণ নয়, গুণগত মান উন্নয়নের উপর জোর দেওয়ার উপর প্রচারণা চালাতে হবে।
- রোগমুক্ত পোনা এবং উন্নত চাষ পদ্ধতির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন চিংড়ি খানায় উচ্চ উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক লাভের আকর্ষনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য কার্যকরভাবে ব্যাপক সরকারি/সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে।
- পি.সি.আর. নেগেটিভ পোনা ব্যবহার এবং উপযুক্ত চাষ পদ্ধতি ব্যবহারের সুফল সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্রুডষ্টক সংগ্রহকারী, হ্যাচারি পরিচালক এবং চিংড়ি চাষিদের প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

- হ্যাচারিগুলো হয় এককভাবে, না হয় দলগতভাবে হোয়াইট স্পট ভাইরাস স্ক্রিনিং -এর সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করবে এবং তাদের সরবরাহকৃত পোনা যে, হোয়াইট স্পট ভাইরাস মুক্ত সে ব্যাপারে সনদ প্রদান করবে।
- পি.সি.আর.নেগেটিভ পোনা দিয়ে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করার জন্য হ্যাচারি মালিক, চিংড়ি চাষি এবং চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষিত চুক্তি প্রথা চালু করতে হবে।
- কাঁচা চিংড়ি, কাঁকড়া বা অনুরূপ কোন প্রানি খাদ্য হিসেবে চিংড়ির খামারে ব্যবহার করা যাবে না।
- মাঠ পর্যায়ে খুব অল্প খরচে এবং অল্প সময়ের মধ্যে হোয়াইট স্পট ভাইরাস নিরূপণ করার জন্য উপযুক্ত ফিল্ড কীটের অনুসন্ধান জরুরী ভিত্তিতে করতে হবে।
- মাঝে মাঝে উদ্ভুত হোয়াইট স্পট ভাইরাস সম্পর্কিত সমস্যাবলী মূল্যায়ন করে তার বাস্তবমুখী সমাধান সুপারিশকল্পে একটি শক্তিশালী টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করতে হবে।

কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- প্রতিরোধই হল হোয়াইট স্পট ভাইরাস রোগ ব্যবস্থাপনার চাবিকাঠি
- ভাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারের পরিবেশ সবসময় স্বাস্থ্যকর ও পীড়ণমুক্ত রাখতে হবে; পরিবেশগত পীড়ণ সুপ্ত ভাইরাস কে সক্রিয় করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে
- হোয়াইট স্পট ভাইরাস মুক্ত পোনা এবং উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা সমন্বিতভাবে ব্যবহার করতে হবে

পলিসি

- অত্যধিক পরিমাণ পোনা উৎপাদনে হ্যাচারি মালিকদের কার্যকরভাবে নিরুৎসাহিত করা হবে।
- বর্তমান হ্যাচারিগুলির উৎপাদন ক্ষমতা সদ্ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন হ্যাচারি প্রতিষ্ঠা অথবা বিদ্যমান কোন হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সরকারি কোন সহায়তা দেওয়া হবে না।
- প্রতি বাগদা চিংড়ি উপজেলায় হোয়াইট স্পট ভাইরাস মুক্ত পোনা ব্যবহার এবং উন্নত চাষ পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে বেশি উৎপাদন এবং বেশি অর্থনৈতিক লাভের আকর্ষনীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা হবে যেন ভাইরাসমুক্ত উন্নত পোনা ব্যবহার এবং উন্নত চাষ পদ্ধতি ব্যবহারে চাষিরা উদ্বুদ্ধ হতে পারে।
- পোনা বিক্রি করার আগে প্রত্যেক হ্যাচারি এই মর্মে ক্রেতাকে সনদ দিতে হবে যে, তাদের সরবরাহকৃত পোনা হোয়াইট স্পট ভাইরাস মুক্ত।
- উৎপাদন ও ব্যবসায়ীক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রত্যেক হ্যাচারি, খামার ও পোনা ব্যবসায়িকে রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত হতে হবে।
- ফীড্ মিল মালিকদের এই মর্মে সনদপত্র দিতে হবে যে তাদের তৈরি ফরমুলেটেড চিংড়ি ও মৎস্য খাদ্য এন্টিবায়োটিকস্ এবং নিষিদ্ধ রাসায়নিক মুক্ত।
- বিভিন্ন এলাকায় খামারগুলোকে গ্রুপে বিন্যাস করে "কন্ট্রাক্ট ফার্মিং" প্রথা চালু করতে হবে। হ্যাচারি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, খাদ্য তৈরি কারখানা এবং চিংড়ি সরবরাহকারীগণ "কন্ট্রাক্ট ফার্মিং" প্রথায় জড়িত হয়ে চিংড়ি খামারীদের উপযুক্ত উৎপাদন সামগ্রী সরবরাহ এবং কারিগরি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করবে।

বাঁশের খাঁচায় কাঁকড়া চাষ
(Crab Culture in Bamboo Cage)

ড. মোহাম্মদ জাফর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract
Grassroot level farmers want a profitable business venture with low investment considering this potentiality, the technology of mud crab fattening in bamboo cages has been fairly accepted by the coastal communities from both local and foreign countries, because all the culture components are cheap and easily available at the local market. In rural areas, there is a bamboo forest adjacent to almost every house, from where the farmers can use bamboo for the cage preparation. This technology can bring radical change to the livelihood of farmers in terms of economic improvement. Research shows that in every harvest, it costs about 1,025 Tk. per cage. After fattening for 15 days, the market price of crab will be 2,500 Tk., and in 15 days, the farmer can earn 1,475 Tk., that is, in every two months with at least 3 harvests per cage, farmers can earn 4,425 Tk. Thus, if a family is able to cultivate mud crab in 4 cages at the same time, the amount of income will be 17,700 Tk. in every two months, that is, 9,000 Tk. per month. As women and unemployed youth might be able to participate in cage management and maintenance, the usual work of the farmer will not be hampered, as a result, financial solvency of the farmers will increase.

ভূমিকা
তৃণমূল পর্যায়ের চাষিরা স্বল্প বিনিয়োগে অধিক লাভের প্রত্যাশায় ব্যবসায়ে উদ্যোগী হন। এ সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে, "বাঁশের খাঁচায় কাঁকড়া চাষ" প্রযুক্তিটি চাষিরা (দেশী ও বিদেশী) সহজে গ্রহণ করছে, কারণ বাঁশের খাঁচা প্রস্তুতের সকল উপকরণ সস্তায় স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ চাষির বাড়িতেই একটি বাঁশঝাড় রয়েছে, যা তারা সহজে ব্যবহার করতে পারবে। তাছাড়া অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে, একজন চাষি বাঁশের খাঁচায় কাঁকড়া চাষ করে তার জীবনের মধ্যে একটি আমূল পরিবর্তন আনতে পারবে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি ফলনে একটি খাঁচায় একজন চাষির মোট বিনিয়োগ ১,০২৫ টাকা। ১৫ দিনে ফ্যাটেনিং করার পর কাঁকড়ার বাজার দর হবে ২,৫০০ টাকা এবং ১৫ দিনে তার প্রকৃত আয় হবে ১,৪৭৫ টাকা অর্থাৎ প্রতি দুই মাসে একটি খাঁচা হতে কমপক্ষে ৩টি ফলনে আয় হবে ১,৪৭৫ X ৩ = ৪,৪২৫ টাকা। এভাবে একটি পরিবার ৪টি খাঁচায় একসাথে কাঁকড়া চাষ করলে প্রতি ২ মাসে ১৭,৭০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক প্রায় ৯,০০০ টাকা আয় করতে পারবে। খাঁচা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় মহিলা ও বেকার যুবকেরা অংশগ্রহণ করতে পারে, চাষিদের অন্যান্য কাজের ব্যাঘাত ঘটেনা, ফলে তার আর্থিক সচ্ছলতা নিত্য বৃদ্ধি পায়।

কাঁকড়া চাষের প্রয়োজনীয়তা
উপকূলীয় অঞ্চলের চাষিরা সাধারণত নদীর মোহনা ও প্যারাবন এলাকা হতে ছোট/বড় সবধরণের কাঁকড়া আহরণ করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশে কাঁকড়ার সম-বৃদ্ধি ঘটেনা। চাষিরা বেশি টাকা পাবার আশায় যথেচ্ছভাবে কাঁকড়া আহরণ করে, কাঁকড়ার প্রজাতির বিস্তৃতির ওপর একটি প্রভাব ফেলতে পারে। তাছাড়া সনাতন পদ্ধতিতে পুকুরে কাঁকড়া চাষ করেও আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। সবদিক বিবেচনা করে, প্রকোষ্ঠযুক্ত বাঁশের খাঁচায় কাঁকড়া চাষ ধারণাটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রবর্তন করা হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে জানা যায়, নরম খোলসযুক্ত কাঁকড়া (>১৮০-২০০ গ্রাম) প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরণ করে খাঁচায় চাষ করলে ১৪-২১ দিনের মধ্যেই বাজার উপযোগী হয়। খাঁচায় এভাবে চাষ করলে প্রাকৃতিক উৎসের ওপর চাপ কমবে, পাশাপাশি চাষিরা অধিক লাভবান হবেন।

চাষিদের আগ্রহের কারণ
উপকূলীয় এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা হচ্ছে মৎস্য ও চিংড়ি পোনা আহরণ। বর্তমানে চিংড়ি ও মাছের পোনা আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তাছাড়া বছরের

সব ঋতুতেই মৎস্য আহরণ করা যায় না, ফলে চাষিদের কর্মহীন জীবনের বোঝা বয়তে হয় এবং অনাহারে থাকতে হয়। জরিপে দেখা গেছে, বেশির ভাগ চাষি আর্থিক অভাব অনটনে ভুগছে, যার কারণে পারিবারিক কোন্দল, সামাজিক অস্থিরতা, শিশুদেরকে সাংসারিক কাজে লাগানো ইত্যাদি বেড়েই চলেছে । তাই চাষিদের কর্মহীন সময়কে কাজে লাগানোর একটি সম্ভাবনাময় অবলম্বন হবে বাঁশার খাঁচায় কাঁকড়া চাষ, ফলে দূর হবে চাষির পারিবারিক ও সামাজিক অস্থিরতা, বয়ে আনবে খুশির বারতা এবং চাষি হবেন আর্থিকভাবে স্বচ্ছল।

চাষিদের করণীয়

স্থান নির্বাচন

খাঁচায় কাঁকড়া চাষের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রবল স্রোতের প্রভাবমুক্ত এলাকা নির্বাচন। এক্ষেত্রে চাষিদের নদীর ধার বেছে নিতে হবে।

প্রজাতি নির্বাচন

সুস্থ্য, সবল ও চলনক্ষম কাঁকড়া মজুদ করতে হবে। মজুদের সময় কাঁকড়ার উপরিভাগের খোলস নরম কিনা তা আঙ্গুল দিয়ে চেপে পরীক্ষা করতে হবে অথবা টর্চ লাইট দিয়ে দেখতে হবে। এভাবে পরীক্ষা কওে ১৮০-২০০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়া মজুদ করতে পারে। এক্ষেত্রে যত বড় জাতি কাঁকড়া চাষ করতে পারবে, তত বেশি লাভ হবে।

খাঁচা নির্মাণ

খাঁচার প্রধান উপকরণ হচ্ছে বাঁশ। সাধারণত বাইজ্যা/মিটেঙ্গা বাঁশ (*Bambusa tulda* and *Bambusa vulgaris*) এ ধরণের খাঁচা প্রস্তুতের উপযোগী। খাঁচার আদর্শ আকার হচ্ছে ৭ X ৩ X ১ ফুট, তবে চাষিরা তাদের প্রয়োজন মতো আকার ছোট-বড় করতে পারবে। খাঁচা পানিতে ভাসিয়ে রাখতে প্লাস্টিক ড্রামের প্রয়োজন হবে।

খাঁচা স্থাপন

জোয়ার-ভাটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চ্যানেল বা মোহনার লবণাক্ত পানিতে খাঁচা স্থাপন করতে হবে। খাঁচা এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যেন সর্বনিম্ন ভাটার সময়েও খাঁচা নদী বা চ্যানেলের তলায় লেগে না যায়। খাঁচার উপরিভাগের চার কোণায় চারটি প্লাস্টিকের ছোট ড্রাম বেঁধে দিতে হবে যাতে এগুলো খাঁচাকে অন্তত ১-১.৫ ইঞ্চি পরিমাণ পানির উপরে ভাসিয়ে রাখতে পারে। নদী বা চ্যানেলের যে স্থানে খাঁচা ভাসাতে হবে সে স্থানে নদী বা চ্যানেলের তলদেশে ভাটার সময় কাঠের ৪টি শক্ত খুঁটি খাঁচার চার কোনায় পুঁততে হবে। এরপর রশির মাধ্যমে খাঁচা ও খুঁটির সম্পর্কের মাধ্যমে খাঁচাটি পানিতে ভেসে থাকবে।

কাঁকড়ার খাদ্য ও পরিচর্যা

মজুদকৃত কাঁকড়াকে প্রতিদিন দু'বেলা, সকাল ও বিকেলে খাদ্য হিসাবে কুইচ্ছ্যা, তেলাপিয়া, ছোটমাছ, চিংড়ির মাথা ইত্যাদি ছোট ছোট টুকরা করে কাঁকড়ার দেহের ওজনের শতকরা ৫ ভাগ হারে প্রতি প্রকোষ্ঠে দিতে হবে। খাবার দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কাঁকড়া পালিয়ে না যায়।

প্রধান শিক্ষনীয় বিষয়

- ❑ স্বল্প ব্যয়ে টেকসই খাঁচা প্রস্তুতির কৌশল
- ❑ নরম খোলস যুক্ত কাঁকড়া নির্বাচন
  (এক্ষেত্রে আঙ্গুল দিয়ে চেপে বা লাইট ব্যবহার করে পরীক্ষা করতে হবে)
- ❑ সস্তা খাবার ও কাঁকড়ার খাবার গ্রহণের সময় ও কৌশল জানতে হবে
- ❑ কাঁকড়া আহরণের সঠিক কৌশল
  (এক্ষেত্রে কাঁকড়া চিমটার সাহায্যে আহরণ করা যায়)

খাঁচা তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষম আগ্রহী চাষি বেছে নিতে হবে

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী

- ❑ যুব মহিলা ও গৃহিণী
- ❑ বেকার যুব সমাজ
- ❑ নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকরী জনগোষ্ঠী

উপসংহার

পল্লী এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের একমাত্র প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দারিদ্র্যতা। আর্থিক অনটনের কারণে পরিবারের প্রধানরা ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে না পাঠিয়ে গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত রাখে, যার ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ সমাজ সর্বোপরি দেশের শিক্ষার হার আশাব্যঞ্জক নয়। চাষিরা এই প্রযুক্তি গ্রহণ করে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হবে এবং পরিবারের অপরিহার্য চাহিদা পূরণ করতঃ তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাতে সক্ষম হবে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা এই কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজে জেন্ডার বৈষম্য দূর হবে, অর্থাৎ উক্ত প্রযুক্তি নারীর ক্ষমতায়নের একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে।

চাষপদ্ধতির আলোকচিত্র

জাতি কাঁকড়া (*Scylla sp.*)

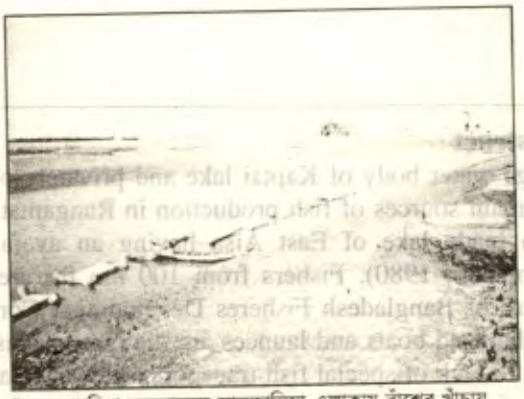

চকরিয়া সুন্দরবনের সাতভালিয়া এলাকায় বাঁশের খাঁচায় কাঁকড়ার ব্যাপক চাষ

প্রকোষ্ঠযুক্ত খাঁচা নদীর মোহনায় স্থাপন করা হচ্ছে

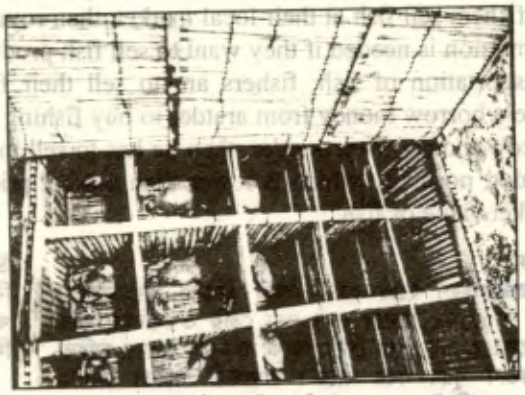

প্রকোষ্ঠযুক্ত খাঁচায় কাঁকড়া চাষ

কাঁকড়ার খাবার (কুইচ্ছ্যা)

খাঁচা পরিচর্যা

পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য পরিবহণ ও বিপণন
(Transportation and Marketing of Fish in Hill Tracts Area)

ইন্দু লাল চাকমা
মোঃ আবদুল খালেক
মৎস্য অধিদপ্তর

Abstract

Large water body of Kaptai lake and privately owned ponds, pen culuture, cage culture are the main sources of fish production in Rangamati Hill Tracts area. Kaptai lake is the largest man made lake of East Aisa having an average area of 86800 hector or 700 sq. Km (Farnando, 1980). Fishers from 100 km far are landed at Rangamati and Kaptai landing centre of Bangladesh Fisheres Development Corporation. Public carrier like country boats, mechanized boats and launces are the only means of fish transportation within Kaptai Lake.. Due to lack of special fish transport wihtin Kaptai Lake, fishers/traders have to wait for long time for public carrier. As a result, spoilage of fish starts. Ultimately producers are to sell those fishes at lower rate. Fishers are to pay royalty to BFDC at the rate fixed by BFDC. If the fishers sell fish at their local market, then royalty is not to be paid. On the other hand, sell permission is needed if they want to sell fish produced in their own pond. Due to lack of rapid transportation of fish, fishers are to sell their fish to intermediate traders. Not only that, fishers borrow money from aratder to buy fishing nets and other fishing equipments. If fishers borrow money from aratdar, then he has to sell their fish to that aratder at a rate fixed by that aratder, normally which is lower than market price. In this way, fisher is deprived of actual market value of fish.

ভূমিকা

বাজারজাতকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যের জন্য পণ্য তৈরি ও বিনিময় করে নিজেদের আরাধ্য পণ্য পেয়ে থাকে যা দিয়ে তাদের চাহিদা ও অভাব পূরণ করে থাকে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় প্রধানতঃ দু'টি উৎস হতে প্রাপ্ত মাছ বাজারে বাজারজাত করা হয়। প্রথমতঃ বিশাল কাপ্তাই হ্রদ হতে আহরণকৃত মাছ এবং দ্বিতীয়তঃ কিছুসংখ্যক কৃষক নিজস্ব সৃষ্ট জলাশয়ে যেমন পুকুর, ক্রীক এবং হ্রদে, পেনে মাছ চাষ এবং খাঁচায় মাছচাষ ইত্যাদি পন্থায় মাছচাষ করে বাজারজাত করে থাকে। কাপ্তাই হ্রদে প্রায় ৫৫৬০ জন স্থানীয় ও অন্য ১০টি জেলা হতে অভিবাসিত মৎস্যজীবী মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত হন (আহমেদ ১৯৯৯)। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ঘাটের পরিমাপ অনুযায়ী বাৎসরিক ৬০০০.০০-৭০০০.০০ মেঃ টন মিঠা পানির মাছ হ্রদে উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে ৭২টি প্রজাতির মাছ এবং ২টি প্রজাতির কুঁচো চিংড়ি (এফ,আর,আই) রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৩৫টি প্রজাতির মাছ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আহরিত হয়। অন্যদিকে জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের মতে এই জেলায় ৬৯০টিরও বেশি পুকুর ও ক্রীক রয়েছে যার আয়তন প্রায় ৩৩২.০৮ হেক্টর। এসব জলাশয়ে বছরে প্রায় ৩২৮.৪০ মেঃ টন ব্যক্তিমালিকানায় মাছ উৎপাদিত হয়। এসব মাছ এই জেলার প্রায় ৫২টি বাজারে বিপণন করার পর একটা বিরাট অংশ উদ্বৃত থাকে যা খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জেলায় বিপণনের জন্য পরিবহণ করা হয়।

বিপণনের জন্য পরিবহণ

কাপ্তাই হ্রদ পূর্ব এশিয়ার সর্ব বৃহৎ মনুষ্য সৃষ্ট একটি হ্রদ (ফারনেন্দো ১৯৮০) যার গড় আয়তন প্রায় ৬৮,৮০০ হেক্টর অর্থাৎ প্রায় ৭০০ বর্গ কিঃমিঃ। এই বিশাল জলাশয়ের আনাচে কানাচে মাছ ধরা হয়। প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ এর বেশি দূর থেকে বিএফডিসির রাঙ্গামাটি এবং কাপ্তাই অবতরণ ঘাটে বিপণনের জন্য নিয়ে আসা হয়। সব মাছ পরিবহণের ব্যবস্থা খুবই নাজুক এবং দ্রুত পরিবহণের কোন ব্যবস্থা নাই। পরিবহণের জন্য সাধারাণত হ্রদে নৌকা, সাম্পান, ইঞ্জিন চালিত নৌকা ও লঞ্চ ব্যবহার করা হয়। অন্য দিকে রাঙ্গামাটি হতে অন্য জেলায় পরিবহণের জন্য ট্রাক ও বাস ব্যবহার করা হয়। এসব যানবাহনে কোন তাপ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নাই। কাপ্তাই হ্রদ থেকে ধৃত মাছ পরিবহণের জন্য এই যান যে সময়ে যাতায়াত করে সে সময়ে পরিবহণ সম্ভব না হলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। ফলে দীর্ঘ অপেক্ষায় মাছ নষ্ট হয়

এবং চাষি মাছ কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। অন্য দিকে পরিবহণ যান পথে খারাপ হলে কিংবা দুর্ঘটনায় পতিত হলে সম্পূর্ন মাছ নষ্ট হয়ে যায়। বিগত ২০০১ সালে জনাব বিকিরণ চাকমার যান চট্টগ্রামের পথে রাঙ্গামাটি রেডিও ষ্টেশনের পাশে দুর্ঘটনায় পতিত হলে প্রায় ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার মাছ নষ্ট হয়। এই লোকসান তাকেই বহন করতে হয়। এভাবে চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি সড়কে অনেক যান দূর্ঘটনায় পতিত হয় এবং এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে তার লোকসান গুণতে হয়। অথচ এ লোকসানের জন্য কোন বীমার ব্যবস্থা নাই। এ ছাড়াও অনেক সময় মাছ পরিবহণের সময় রাজনৈতিক ক্যাডারদের এবং চাঁদাবাজদেরকে বড় অংকের চাঁদা দিতে হয়। অন্যথায় অপহরণ করে তা আদায় করা হয়। পরিবহণের সময় শুধু বাঁশের ঝুড়ি কিংবা ষ্টিলের হাফ ড্রামে মাছ পরিবহণ করা করা হয়।

মাছ ধরার অনুমতি ও রয়েলটি প্রদান

বিগত ১৯৬৪ সাল হতে কাপ্তাই হ্রদ মাছ আহরণের জন্য উক্ত কর্পোরেশন হতে জালের ধরণ এবং আকার অনুযায়ী নির্ধারিত ফি দিয়ে জালের লাইসেন্স নিতে হয়। সাধারণতঃ মৎস্য জীবীদের পছন্দ ও সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট প্রজাতির (কেচকী, ডেকা ও টেংরা) মাছ আহরণের জন্য নয় ধরণের ফাঁস জাল, দুই ধরণের ঠেলা জাল (বড় ও ছোট), এক ধরণের তোলা জাল (ধর্মজাল) এবং চার ধরণের বড়শী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে জাগ ও বড়শীর জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয় না।

ইতোপূর্বে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কে মাছের প্রজাতি ভেদে ৩০%-৪০% ভাগ মাছের অংশ রয়েলটি হিসাবে দিতে হতো। তবে স্থানীয় বাজারে বিক্রিত মাছের কোন রয়েলটি দিতে হয় না। অন্য দিকে মৎস্য চাষি নিজস্ব জলাশয়ে মাছ উৎপাদনের পর মাছ বিক্রির জন্য ঐ এলাকার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট থেকে অনুমতি পত্র নিয়ে মাছ বিক্রি করে থাকে। ইহা অনেকটা এখানকার নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষ রোপনের মতই জোট মালিককে বিক্রির পূর্বে পারমিট নিতে হয়।

মৎস্য বাজারজাতকরণ

কাপ্তাই হ্রদ থেকে আহরিত মাছের বিপণন প্রক্রিয়া অন্যান্য জলাশয়ের মাছের বিপণন ব্যবস্থার চেয়ে অনেকটা জটিল। হ্রদের ভৌগলিক অবস্থান, যোগাযোগ অবস্থার অপ্রতুলতা এবং মৎস্য চাষিদের সমবায় পদ্ধতির অভাবের কারণে এই জটিলতার সৃষ্টি হয়। মাছ একটি দ্রুত পচনশীল পণ্য। তাই মাছ ধরার পর হতে দ্রুত বাজারজাত করার অসুবিধার দরুণ মৎস্যজীবীরা সরাসরি মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের রাঙ্গামাটি ও কাপ্তাই অবতরণ ঘাটে তাদের উৎপাদিত বা ধৃত মাছ নিয়ে আসতে পারে না। ফলে মাছ বিক্রির জন্য তাদের বিভিন্ন শ্রেনীর ব্যবসায়ী বা ফড়িয়া বা কমিশন ভোগীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও অধিকাংশ মৎস্যজীবী বড় ব্যবসায়ীদের নিকট হতে মাছ ধরার সরঞ্জাম ও ঋণ বা দাদন নিয়ে থাকে, বিনিময়ে ঋণ দাতা ব্যবসায়ীকে নির্দিষ্ট মূল্যে আহরিত মাছ সরবরাহ করতে হয়। স্থানীয় বাজারে ছোট ব্যবসায়ীরা জেলেদের কিংবা চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি মাছ ক্রয়ের সুযোগ কমই পাই। তারা মাত্র ২০% হতে ৩০% মাছ সরাসরি ক্রয় করেন। বাঁকী প্রায় ৭০% হতে ৮০% ভাগ তারা পাইকার ও ফড়িয়াদের কাছ থেকে ক্রয় করে বিক্রি করেন। এ পর্যায়ে ভোক্তাদের কাছে মাছ পৌছতে ২/৩ বার হাত বদল হয়। আর বাজারে এই মাছ যেখানে বিক্রি হয় সে সব জায়গা স্যাতস্যাতে ভিজা, দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। সেখানে কোন স্বাস্থ্যসম্মত ও রোগ জীবাণু মুক্ত করার কোন ব্যবস্থা নেই। অনেক বাজারে সেড থাকে না, এমনকি মাছ বিক্রির জন্য বসার জায়গাও পাওয়া যায় না। এরপরও হাট বাজারে মাছ বিক্রির কমিশন আদায় করা হয়। মাছ বিক্রির পূর্বে কোন নির্ধারিত মূল্য থাকে না। মাঝে মাঝে বাজারে কম পরিমাণে মাছ আমদানি হওয়ায় বেশি দামে মাছ ক্রয় করে বেশি মূল্যে মাছ বিক্রি করতে হয়।

সংরক্ষণ

মাছ একটি দ্রুত পচনশীল পণ্য। মাছের মৃত্যুর পর রাইগরমরটিস প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ অবস্থায় মাছের পেশী সতেজ থাকে। রাইগরমরটিস বিলুপ্তির পর হতে মাছের পচন শুরু হয়। মাছ আহরণের পর থেকে বাজারজাতকরণের মধ্যবর্তী সময় যত দেরি হবে, মাছের পচন তত বেশি হবে। এই পচন রোধকল্পে শুধুমাত্র বরফ দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। অন্য কোন সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা যেমন শীতলীকরণ, হিমায়িতকরণের মাধ্যমে গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা নাই। এমন কি পরিবহণের সময়ও কোন তাপ প্রতিরোধক যানের ব্যবস্থা নাই।

মৎস্য ব্যবসায়ীদের ভূমিকা

হ্রদের মৎস্য ব্যবসায়ীরা নিজ উদ্যোগে তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তারা কোন মাছের উৎপাদন ও অবকাঠামো নির্মাণের সাথে জড়িত নয়। অত্যন্ত কম পরিমাণে ফি দিয়ে তারা মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে কিছু মধ্যসত্ত্বভোগী গ্রুপ নিয়মিত বেতনভূক্ত বা ভাড়াটিয়া। তারা মাছ ক্রয়, পরিবহণ, মাছ বিক্রি এবং সরবরাহের কাজে নিয়োজিত থাকেন। এ ধরনের প্রায় ১৮৫ জন নিয়োজিত ট্রেডার্স স্থানীয়ভাবে যাদের সওদাগর বলা হয় তারা হ্রদ ব্যবস্থপনায় নিয়োজিত আছেন। তাদের মধ্যে বর্তমানে প্রায় ৩০ জন সিংহভাগ লভ্যাংশ পায় (আহমেদ ১৯৯৯), তাদেরকে বড় সওদাগর বা মাষ্টার ট্রেডার্স বলা হয়। বড় সওদাগররা খুবই প্রভাবশালী।

মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

প্রকৃত মৎস্য উৎপাদনকারী ও জেলেরা খুবই দরিদ্র। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তেমন কোন গবেষণা বা তথ্য নাই। এফআরআই এর মতে জেলেদের মধ্যে ৪৫% মুসলিম,

৩১% হিন্দু এবং ২৪% বিভিন্ন উপজাতি। জেলেদের অধিকাংশই অশিক্ষিত তবে বর্তমানে কিছু উপজাতি এবং অউপজাতীয় শিক্ষিত বেকার যুবক মাছ ধরার এবং মাছ চাষের কাজে নিয়োজিত আছে। কাপ্তাই হ্রদে মাছের প্রজনন মৌসুমে যখন হ্রদের মাছ ধরা বন্ধ থাকে তখন তাদের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তাদের অবস্থা খুবই শোচণীয় হয়ে পড়ে। অনেক জেলেদের মাছ সতেজ ও তাজা রাখার অভিজ্ঞতা না থাকায় মাছের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। দাদন নিয়ে মাছ ধরতে হয় বলে বাজার দরের চেয়ে কম মূল্যে সওদাগরের কাছে মাছ দিতে বাধ্য থাকে। আর এভাবেই তারা দিন দিন নিঃস্ব থেকে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই জেলায় মৎস্যচাষি এবং মৎস্য জীবীদের নিম্নের সমস্যাদি পরিলক্ষিত হয়।

ক. বাজারে নেয়ার পূর্বে অসুবিধা

১. উৎপাদিত জায়গা হতে বাজার দূরে অবস্থিত।
২. দ্রুত পরিবহণের ব্যবস্থা নাই এবং সময় মত পণ্য পৌছানো যায় না।
৩. প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বরফের অভাব।
৪. তাপ প্রতিরোধক যানের অভাব।
৫. অনেক সময় আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য চাঁদা দিতে হয়।

খ. ক্রয়ের সময় অসুবিধা

১. বাজারে সেড না থাকায় মাছ ক্রয় বিক্রয়ের অসুবিধা
২. মাঝে মাঝে বাজারে মাছের আমদানি কম হওয়ায় বেশি দামে মাছ ক্রয় করতে হয়।
৩. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা বন্ধ থাকাকালীন সময়ে বিকল্প কাজ না থাকায় জীবন জীবিকার অসুবিধা।
৪. ব্যবসার জন্য মূলধনের অভাব।
৫. পূর্ব নির্ধারিত মূল্য না থাকায় মূল্য নির্ধারণের অসুবিধা।
৬. সমবায় ভিত্তিতে মাছ ক্রয়ের ব্যবস্থা নাই।
৭. বিনষ্ট মাছের জন্য বীমার ব্যবস্থা নাই।
৮. অতি বর্ষায় রাস্তা বন্ধ হলে, অন্য জায়গায় মাছ পরিবহণ করা যায় না।

গ. বিক্রয়ের সময় অসুবিধা।

১. বাজারে সেড না থাকায় বিক্রির অসুবিধা
২. বাজারে বিক্রির নির্ধারিত স্যাঁতস্যাঁতে নোংরা জায়গায় মাছ বিক্রি করতে হয়।
৩. স্বাস্থ্যসম্মত ও রোগজীবাণু মুক্ত করণের ব্যবস্থা নাই।
৪. অনেক সময় নির্ধারিত স্থানে জায়গা পাওয়া যায় না।
৫. উদ্বৃত্ত মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই।

মৎস্যজীবীদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য কয়েকটি সুপারিশ

ক. বাজার দূরে দূরে অবস্থিত, তাই পণ্য ক্রয়ের কয়েকটি নির্দিষ্ট পয়েন্টের ব্যবস্থা করতে হবে।
খ. দ্রুত পরিবহণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।
গ. মাছ সতেজ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বরফ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
ঘ. আইন শৃংখলা পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে।
ঙ. বাজারে পণ্য বিক্রির নির্দিষ্ট স্থানে উন্নত মানের সেড তৈরি করা প্রয়োজন।
চ. বাজারে যাতে পণ্যের আমদানি না কমে সেজন্য কিছু মাছ হিমায়িত করে মজুদ রাখার ব্যবস্থা করা।
ছ. পর্যাপ্ত মৎস্য ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।
জ. দূরে মাছ পরিবহণের সময় বীমার ব্যবস্থা করতে হবে।
ঝ. পণ্য বিক্রেতারদের সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে।
ঞ সরকারীভাবে মাছের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।
ট. রাঙ্গামাটি হতে তাপ প্রতিরোধক ভ্যানে পরিবহণের ব্যবস্থা এবং মজুদের জন্য তাপ প্রতিরোধক বাক্সের ব্যবস্থা করাতে হবে।

দূষণমুক্ত সাগর সুস্থ সবল অর্থনীতির পূর্বশর্ত
(Pollution free Sea: A Prerequisite for Sound Economy)

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন খান
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

Abstract

Merchant ships carry seawater as ballast material to help sink the propellers and radars and to help stabilize the ships when make ways through water in an un-loaded cargo condition. The ballast water is discharged in foreign port areas where the ship loads cargo. In this way exotic fauna and flora find ways to make bio-invasion to a different ecosystem where in many cases several of them dominate over the native species and form colonies of exotic species in a native ecosystem. This may cause serious disease outbreaks as epidemics e.g. cholera and red tides as they carry pathogens and din-flagellates those produce algal blooms in the ballast tanks. This has direct impact on coastal aquaculture and mari-culture and even to the human health around the port areas. In many instances the invasive fauna and flora eliminate several economically important species of fish and shellfish and badly affects the fisheries of the country concerned. USA for example had to incur a loss of 138 billion US Dollars due to bio-invasion in several of its ports. This has now become a global issue and many countries have already taken attempts to minimize the impacts. IMO along with GEF and UNDP has a continued effort to reduce this bio contamination. Bangladesh is yet to develop its programme to protect bio-invasion. A coordinated approach, particularly by the biological institutions, is needed to address the problem with immediate effect. This would include a strong faunal and floral database of the port waters and a strong electronic monitoring system of the flora and fauna coming in and going out through the exchange of ballast water.

প্রকৃতি এবং পরিবেশের ওপর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব ও উন্নতি নির্ভরশীল। নিঃসন্দেহে এটা সত্য যে বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এ সচেতনতা মূলতঃ দেশের স্থলভাগভিত্তিক। উপকূলীয় বা সামুদ্রিক পরিবেশ দুষণকে এখন পর্যন্ত মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। বাংলাদেশের ভূমিভিত্তিক আয়তন প্রায় ১,৪৭,০০০ বর্গ কি.মি.। অপরদিকে দক্ষিণ-পূর্বে টেকনাফ হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবন পর্যন্ত ৭১৪ কি.মি. সুদীর্ঘ তটরেখাসহ দেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (ই.ই.জেড.) তথা সামুদ্রিক জলায়তন প্রায় ১,৬৬,০০০ বর্গ কি.মি.। দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনেও বিশাল জলরাশিতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ও টেকসই ব্যবস্থা উন্নয়ন ঘটানোর কোন বিকল্প নেই। 'টেকসই উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ অনিবার্য' এই দৃষ্টিকোণ সারা বিশ্বে যেমন অগ্রাধিকার পাচ্ছে বাংলাদেশেও তেমনি সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এলক্ষ্যে একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশিতে আমাদের অজান্তে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে পরিবেশ দুষণের নানা ঘটনা। আমরা 'ক্লাইমেটিক চেঞ্জ', 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং', 'গ্রিন-হাউজ এফেক্ট' ইত্যাদি ধারণার সাথে কিছুটা পরিচিতি লাভ করেছি। এমনকি আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল অংশ নিমজ্জিত হবার আশংকায় আশংকিত। কিন্তু বিশাল সমুদ্র এলাকার ঘটে যাওয়া দুষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা অনেকাংশে উদাসীন এবং তার প্রতিরোধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে আমাদের ধারনা খুবই সীমিত এবং এ বিষয়ে আমরা নির্বিকার।

সমুদ্র দূষণের প্রধান কারনসমূহ

বর্তমান বিশ্বে খাদ্য, পরিবহন, বিনোদন এবং শক্তির উৎস হিসাবে সমুদ্রকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এসকল উৎসের ওপর বাংলাদেশের জনগনও ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু সমুদ্র সম্পদের সফল ব্যবহার বিঘ্নিত হতে পারে দুষণের কারণে। সমুদ্রে ও মোহনার পানিতে মানবসৃষ্ট কর্মকান্ডের দ্বারা কোন বস্তু, দ্রব্য বা শক্তির অনুপ্রবেশের ফলে সমুদ্রের প্রাণীজগত তথা মানবজাতির স্বাস্থ্য, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও জীববৈচিত্র্যের জন্য হানিকর যেকোন কাজই সমুদ্র দূষণের পর্যায়ে পরে। সমুদ্র দূষণের অন্যতম প্রধান কারণগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

ব্যালাষ্ট ওয়াটার ডিসচার্জের মাধ্যমে জৈবিক সংক্রমণ

সমুদ্রে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ হতে ব্যালেস্ট ওয়াটার ডিসচার্জ করা হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক জাহাজ সমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বন্দরে পণ্য খালাসের পর জাহাজের সুষ্ঠু চলাচলের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট বন্দরের পানি জাহাজের ব্যালেস্ট ট্যাঙ্কে ভর্তি করে থাকে। ইহাই ব্যালেস্ট ওয়াটার। জাহাজ পুনরায় অন্য বন্দরে পণ্য বোঝাই/খালাস করার সময় উক্ত ব্যালাষ্ট ওয়াটার ডিসচার্জ করে থাকে। এতে এক দেশের প্রাণী ও ক্ষুদ্র উদ্ভিদ অন্য দেশের সাগরে প্রবেশ করে। ব্যালেস্ট ওয়াটার ডিসচার্জের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মৎস্য সম্পদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়াসহ জৈবিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশকে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে কলেরা ও রেড টাইড সহ মারাত্মক রোগের বিস্তার ঘটছে। এটি বর্তমানে একটি জটিল ও মারাত্মক সমুদ্র দূষণ হিসাবে পরিচিত।

ব্যালাষ্ট ওয়াটার ডিসচার্জ সংক্রান্ত সমস্যাবলী

পণ্যবাহী সকল জাহাজ ব্যালাষ্ট ওয়াটার বহন করে থাকে। জাহাজের ভারসাম্য রক্ষা করা,প্রোপেলার ও রাডারকে পণ্য বোঝাই বিহীন অবস্থায় পানিতে নিমজ্জিত রাখার জন্য জাহাজকে ব্যালাষ্ট ওয়াটার বহন করতে হয়। অতীতে ব্যালাষ্ট হিসাবে জাহাজ পাথর অথবা বালি ব্যবহার করতো কিন্তু তা ছিল কষ্টসাধ্য,সময় সাপেক্ষ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যয় বহুল। বর্তমান সময়ে জাহাজ ব্যালাষ্ট পদার্থ হিসাবে সামুদ্রিক পানি ব্যবহার করে থাকে । এক দেশের জাহাজ অন্য দেশে পণ্য পরিবহন করে নিয়ে যাওয়ার পর যে বন্দরে পণ্য খালাস করে, সে বন্দর হতে মাল খালাসের সময়েই ব্যালাষ্ট পদার্থ হিসাবে ঐ বন্দর হতে পানি ব্যালাষ্ট ট্যাংকে ভর্তি করে। সে পানিসহ জাহাজটি নিজ বন্দরে অথবা অন্য বন্দরে মাল বোঝাই করতে গেলে পুনরায় মালামাল বোঝাই করার পূর্বেই ব্যালাষ্ট ট্যাংকে ধারণকৃত অন্য দেশের পানি তার নিজ দেশে অথবা অন্য কোন দেশের পোর্ট এলাকায় ত্যাগ করে।

ব্যালাষ্ট হিসাবে বহনকৃত পানিতে বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ থাকে যা অধিকাংশেই নিজ দেশে নিজস্ব জলজ পরিবেশে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে না। কারণ পরিবেশই তা নিয়ন্ত্রন করে। কিন্তু ভিন্ন দেশের জলজ পরিবেশে ফেলার পর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় ,যা অনাকাংক্ষিত এবং অজানা রকমের মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি করে সে দেশের ইকোসিস্টেমে। ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য নষ্ট করা থেকে শুরু করে এমনকি মহামারীরূপে কলেরার প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করে সে সকল বন্দরে জনজীবন বিঘ্নিত করে।

সারা পৃথিবীতে এক দেশ হতে অন্য দেশে যত পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে, তার শতকরা ৯০ ভাগই বহন করা হয় সমুদ্র পথে। IMO এর হিসাবে দেখা যায়,এভাবে ২-৩ বিলিয়ন টন ব্যালাষ্ট ওয়াটার প্রতি বছর সারা বিশ্বে ডিসচার্জের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই মারাত্মক বলে প্রতীয়মান হয় এবং বিভিন্ন দেশে তা মূল্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

ব্যালাষ্ট ওয়াটার ডিসচার্জের ক্ষতিকারক প্রভাবসমূহ

অনেক প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ ব্যালাষ্ট ট্যাংকেই মারা যায়। আবার অনেক প্রজাতি ভিন্ন পরিবেশের পানিতে বাঁচতে পারে না, তবে স্বল্পসংখ্যক প্রজাতি হলেও অন্য পরিবেশে বেঁচে থাকে এবং শুধু বেঁচে থাকাই নয় dominate করে যায় এবং নিজেদের কলোনী বিস্তারের ফলে সে পরিবেশের জীববৈচিত্র্য ও খাদ্য চক্রের ভারসাম্যের আমূল পরিবর্তন ঘটায়, যা সে দেশের মৎস্য সম্পদের ওপর সহজেই অবাঞ্ছিত পরিবর্তন আনে ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক প্রজাতি অনেকক্ষেত্রেই বিলুপ্তি ঘটে। এমন ধরনের প্রমান বিভিন্ন দেশে গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনি একটি ক্ষতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত মৎস্য সেক্টর থেকে ১৩৮ বিলিয়ন ডলার লেলাকসান (Global Ballest Water Managament Programme IMO,2002) হয়েছে।

ব্যালাষ্ট ওয়াটার ও সেডিমেন্টের সাথে অগনিত ডিম, লার্ভা ও প্লাংটনিক ফর্মে বহু জাতের প্রাণী শিকর গেড়ে বসতে পারে। যা পরবর্তী পোর্টে ডিসচার্জের পর সেখানে যে কোন অবলম্বনে (substratum) আশ্রয় নিয়ে পরে বিকাশ ও অবাঞ্ছিত আকারে কলোনী তৈরী করে Native Species হটিয়ে জায়গা দখল করে নেয় এবং দিনে দিনে Bio-Community-তে dominate করে। এমন শত শত উদাহরণ ইতোমধ্যেই পাওয়া গেছে। তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইউরোপিয়ান জেব্রা মাসেল যা আমেরিকান গ্রেট লেকের ৪০%এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ও জঞ্জাল সৃষ্টি করে। এতে ৭৫০মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয় এবং তার প্রতিকার করার জন্য গত দশ বৎসরে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ হয়।

বিভিন্ন প্রকার মাইক্রো-উদ্ভিদ ও ক্ষতিকর Dinoflagellets পরিবহনকালীন সময়েই ব্যালাষ্ট ট্যাংকে Bloom হয় যা অন্য বন্দরের পানিতে discharge করার পর সেখানে রক্তিম স্রোতের সৃষ্টি করে। এর ফলে উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন প্রাণীর ওপর বিশেষ করে চাষকৃত অবস্থায় aystin, mussel, seallys, pronen & shrimp এর ব্যাপক মড়ক

ঘটায় মহামারীর মত। এ সকল invasive প্রাণী একবার শেকড় গাড়তে পারলে তাকে দূর করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। সারা জীবনই এর জের বইতে হবে।

সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

"টেকসই সমুদ্র-পরিবেশ উন্নয়ন" বিষয়টি কারও একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার সম্মিলিতভাবে সকল পক্ষের উদ্যোগ। আশার বিষয়, সমুদ্র দূষণ প্রতিরোধ ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ কাজে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা নিয়োজিত আছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা (IMO) প্রধান ভূমিকা পালন করছে। আই. এম. ও. এবং অন্যান্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে সমুদ্রের পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে বিগত ত্রিশ বছরে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক দলিল তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে ৭০ টির অধিক আইন সরাসরি সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত। জাতিসংঘের মাধ্যমে সমুদ্র আইন বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়, যা United Nations Convention on the Law of the Seas (UNCLOS) নামে পরিচিত। এই কনভেনশনে সমুদ্র সীমা নির্ধারণ থেকে শুরু করে সমুদ্র সম্পদ ব্যবহার বিষয়ক একাধিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যার মধ্যে সমুদ্র দূষণ ও সমুদ্র পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। এই কনভেনশনের আওতায় International Seabed Authority, International Tribunal for the Law of the Sea, Commission on the Limits of the Continental Shelf নামে একাধিক কমিটি গঠিত হয়। বাংলাদেশে এই কনভেনশনের কার্যক্রম ১৯৯৪ সালে সূচনা করা হয়। Ballast Water Control and Management এর বিষয়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন, UNDP, IUCN, SCAP, ও GEF বেশ কয়েক বছর যাবত কাজ করে যাচ্ছে।

সমুদ্র পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রনে বাংলাদেশের ভূমিকা

বাংলাদেশে সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও সমুদ্র পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কোন নির্দিষ্ট আইন নেই। তবে The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1994 এর মাধ্যমে সরকার সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এ ছাড়া The Coast-Guard Act, 1994 এ সরকার বাংলাদেশের মেরিটাইম জোনে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং সরকারের নির্দেশ মতো কাজ করার কথা বলা আছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে Ballast Water গ্রহণ ও পরিত্যাগের মাধ্যমে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়কল্পে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি ভারতের গোয়া'য় অবস্থিত National Institute of Oceanography তে অনুষ্ঠিত Ballast Water Control and Management সংক্রান্ত আঞ্চলিক সভায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে Ballast Water Discharge এর মাধ্যমে জৈব আগুন্তক প্রজাতি (Bio-invasion) রোধ করার কার্যক্রম সূচনা হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের করণীয় সম্পর্কিত কতিপয় প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও সমুদ্র-দূষণ নিয়ন্ত্রণ, খনিজ ও মৎস্য সম্পদ আহরণ, উত্তোলন ও ব্যবহারের বিষয়ে একটি ব্যাপক ভিত্তিক জাতীয় আইনের প্রয়োজন আছে। যেমন,

১. আই. এম. ও. এবং বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বর্জ্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণে "Initiative of Ship Generated Wastes বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।
২. জীববৈচিত্র্য ও মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মেরিন পার্ক বা সামুদ্রিক সংরক্ষিত অঞ্চল গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।
৩. উপকূলীয় জেলা/থানা/ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগনের মধ্যে সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।
৪. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দূষণ মূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।
৫. Ballast Water Control and Management এর অংশ হিসাবে দেশে এসংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা এবং টাস্কফোর্সের মাধ্যমে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধন করে Bio-Invasion দূরীকরণের জন্য জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও প্রতি পোর্টে Faunal and Floral Survey and Database তৈরী করা এবং Electronic Monitoring System চালু করার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

পৃথিবীর ৮০% সম্ভাব্য সম্পদ আছে সমুদ্রে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হবে সঠিক ভাবে সমুদ্র ব্যবহারের ভিত্তিতে। বাংলাদেশের জন্য এটি আরও প্রকটভাবে সত্য, কেননা ভূমি ভিত্তিক অপ্রতুল সম্পদের কারণে ভবিষ্যতে আমাদেরকে সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। আর সে কারণে প্রয়োজন দূষণমুক্ত সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষায় সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার।

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর সমুদ্র দূষণের প্রভাব

সমুদ্র দূষণে যে সকল বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে বিশেষ করে ব্যালাস্ট ওয়াটার ডিসচার্জের মাধ্যমে bio- invasion এর ফলে জীববৈচিত্র্যের ওপর এবং মৎস্য উৎপাদনের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। এ সম্পর্কে এখনই সচেতন না হলে মৎস্য সেক্টর হতে কর্মসংস্থান বিঘ্নিত হতে পারে যা দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উপরন্তু সমগ্র সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরে উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায় উপকূলীয় চিংড়ি ও মাছ চাষের ক্ষেত্রে। এতে সম্পূর্ণ ফসল ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে Bio invasion এর কারণে আমাদের সমুদ্র উপকূল Native species (যেমন বাগদা বা গলদা) চাষের সম্পূর্ণ অনুপোযোগী হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতঃ এক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে সুপরিকল্পিত কার্যক্রম অবিলম্বে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আমাদের অজান্তে হয়তো এ ধরনের আংশিক প্রভাব ইতোমধ্যে ঘটে গিয়ে থাকতে পারে। কারণ আমাদের এ বিষয়ে কোন তথ্য / উপাত্ত নেই। অধুনা মেডিকেল সাইন্সের উন্নতির কারণে যে সকল জটিল রোগ সম্পর্কে মানুষ সুষ্ঠু ধারণা পেতে পারে অতীতে জ্ঞানের অভাবে সে সকল রোগকে জিনে ধরা বা ভূতে ধরা বলে চিহ্নিত করা হত এবং ঝাড় ফোকের মাধ্যমে-চিকিৎসা করা হত। Ballast Water এর মাধ্যমে Bio invasion এর বিষয়টির আমাদের কাছে ও এ ধরনের ভুল diagnosis করতঃ ভুল কর্মসূচি গ্রহণ করে ব্যর্থ চেষ্টায় সময় ও অর্থ অকারণে ব্যয় হতে পারে। তাই এ বিষয়ে সম্যক গবেষণা ও পরীবিক্ষণ কার্যক্রম অবিলম্বে হাতে নেয়া প্রয়োজন।

জলাভূমি সম্পদ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে মাচ্ (MACH) প্রকল্প

MACH Project: Wetland Resource Conservation & Poverty Alleviation

ফখরুল ইসলাম, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

এস এন চৌধুরী, মাচ্ প্রকল্প

Abstract

Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry (MACH) is a project under the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries & Livestock and assisted by USAID. This project was started in October 1998 and is being executed by four national and international NGOs namely, BCAS, CNRS, Caritas and Winrock International. MACH project has promoted ecologically sound co-management of floodplain resources for sustainable supply of food to the poor in the project areas as a pilot program. MACH has involved all community resource users and established 16 Resource Management Organizations (RMO) and established institutional linkage with local Government at Upazila level. In addition to resource management, MACH has organized poor fishers and other poor people of the society and provided micro-credit support for their alternate income generation activities with a view to reduce excessive fishing pressure on the resources and uplift their socio-economic condition. As a result fishing pressure has reduced by 20-30% and average individual supplemental income increased by 47% (ranging from 40-52%). More than 5,000 people have been benefited from this support. For wetland habitat restoration MACH has undertaken several activities viz, excavation of silted beels, establishment of sanctuaries, plantation in swamp and riparian areas with native species, re-introduction of threatened fish species etc. RMOs are involved in all of these activities. As an impact of these activities fish yield in the wetlands under the project areas has increased ranging from 316-389 kg/ha against baseline yield 58-171 kg/ha. Population of 8-10 threatened fish species have re-established in the project areas.

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্লাবনভূমি পৃথিবীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমির একটি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য আর জীববৈচিত্র্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পদ। এছাড়াও লক্ষ লক্ষ মানুষের খাদ্য, পুষ্টি তথা জীবন-জীবিকার উৎস হচ্ছে এসব জলাভূমির বিভিন্ন সম্পদ। গুরুত্বপূর্ণ এ জলজ সম্পদ বিভিন্ন মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে, যেমন- পলি জমে জলাভূমি ভরাট হওয়া; জলাভূমি, নদী ও বিলের আন্তসংযোগ অবলুপ্তি; মাছ ধরার জন্য ধ্বংসকারী উপকরণ ব্যবহার এবং মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ; কৃষি কাজ, শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব এবং জলাভূমি সেচে মৎস্য আহরণ; মিল-কারখানার বর্জ্য পদার্থ জলাভূমিতে নিক্ষেপণ; অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ফলে আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে মাছের উৎপাদন, প্লাবনভূমির অনেক উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাণিবৈচিত্র্য। জলাভূমি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আর্থিক সহায়তায় "সমাজভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা" (Managemet of Aquatic Resources through community Husbandry) নামক এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। এটি বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প। তবে ৪ টি দেশী বিদেশী এনজিও এর মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন হচ্ছে। মাচ্ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ হতে অক্টোবর ২০০৬ পর্যন্ত।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় জলাভূমির সম্পদ সুরক্ষা করা এবং এ সম্পদের ওপর প্রকৃত নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা, বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা এবং তাদের খাদ্যের টেকসই যোগান নিশ্চিত করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী সরকারের পিআরএসপি এর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা

জেলা	উপজেলা	এলাকা
মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল	হাইল হাওরস্থ ২৬ টি বিল
গাজীপুর	কালিয়াকৈর	তুরাগ-বংশী নদীর প্লাবনভূমিস্থ ৩ টি বিল এবং তুরাগ নদীর অংশ বিশেষ
শেরপুর	শেরপুর সদর ঝিনাইগাতী	কংস-মালিঝি নদীর প্লাবনভূমিস্থ ৫ টি বিল এবং মালিঝি নদীর অংশ বিশেষ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

এটি একটি সরকারী প্রকল্প হলেও প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে নিম্নের ৪ টি দেশী বিদেশী এনজিও দ্বারা এবং সরকার এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

- উইনরক ইন্টারন্যাশনাল (Winrock International)
- বিসিএএস (Bangladesh Centre for Advanced Studies)
- সিএনআরএস (Center for Natural Resource Studies) এবং
- কারিতাস বাংলাদেশ (Caritas Bangladesh)

প্রধান কার্যসমূহ :

- সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠা (আরএমও)
- সম্পদ ব্যবহারকারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা (এফআরইউজি)
- জলাভূমি বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম
- মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন
- আবাস ভূমি (জলাভূমি) পুন:সংস্কার
- বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছ পুন: প্রতিষ্ঠাকরণ
- জলাভূমির সম্পদের ওপর হতে চাপ কমানোর জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান
- জলাভূমি সম্পদ সংরক্ষণের ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে সুপারিশকরণ
- জলাভূমি সংশ্লিষ্ট ওয়াটারসেড ব্যবস্থাপনা

১. জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা

কার্যক্রম	হাইল হাওর (শ্রীমঙ্গল)	তুরাগ-বংশী (কালিয়াকৈর)	কংস-মালিঝি (শেরপুর)
ক. সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠা	▪ ৮ টি	▪ বিল পর্যায়ে ২ টি	▪ বিল পর্যায়ে ৪ টি
খ. সম্পদ ব্যবহারকারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা	▪ ৫টি	▪ ৩টি	▪ ৫টি
গ. ব্যবস্থাপনাধীন বিল	▪ বিল ২৬ টি (আয়তন ১১৭২ একর)	▪ বিল ৩ টি (আয়তন ৫৬.২৭ একর) ▪ তুরাগ নদীর অংশ বিশেষ	▪ বিল ৫ টি (আয়তন ১৯৪.৩৬ একর) ▪ মালিঝি নদীর অংশ বিশেষ
ঘ. অভয়াশ্রম স্থাপন	▪ মোট ২৭ টি ▪ বিলের আংশিক এলাকায় ২৫ টি ▪ সমগ্র বিল ২ টি	▪ মোট ২৩ টি ▪ বিলের আংশিক এলাকায় ১৪ টি ▪ বিলে ২ টি ও তুরাগ নদীর কুমে ৩টি ▪ খালে ৪ টি	▪ মোট ২৩ টি ▪ বিলের আংশিক এলাকায় ২২ টি ▪ মালিঝি নদীতে ১ টি
ঙ. বিল-খাল সংস্কার	▪ বিল ১৪ হেক্টর ▪ খাল ১১.২কি মি.	▪ বিল ২১ হেক্টর ▪ খাল ৯.৫ কিমি.	▪ বিল ১১ হেক্টও ▪ খাল ৯.৮ কিমি.
চ. বৃক্ষ রোপন	▪ রাইপেরিয়ান : ৭৬.৪২১ টি (৭৩.৪৫ কিমি) ▪ জলজ বৃক্ষ : ৬০,৯০৫ টি (১০ কিমি ও ১৬ হেক্টর) ▪ প্রাতিষ্ঠানিক বৃক্ষ রোপন : ১৯,৯৮৬টি	▪ রাইপেরিয়ান : ৬১,৯২৯ টি ৪০ কিমি এবং ১০ হেক্টর) ▪ জলজ বৃক্ষ : ১৮০০০ টি (২ কিমি ও ৬ হেক্টর) ▪ প্রাতিষ্ঠানিক বৃক্ষ রোপন : ২৭,৬০০ টি	▪ রাইপেরিয়ান : ২০৫,৬৩৬ টি (১৮২ কিমি ও ১১.৫৮ হেক্টর) ▪ জলজ বৃক্ষ : ৩৪,৮০৩ টি (২৫ কিমি) ▪ প্রাতিষ্ঠানিক বৃক্ষ রোপন : ৩২৫৭২ টি
ছ. বিলুপ্ত প্রায় মাছের পোনা মজুদ	৫৯৬৬৬৩ টি (আইর, গইন্না, রুই, সরপুটি, কালিবাউস)	১৭৯২২৯ টি (গইন্না, রুই, সরপুটি, কালিবাউস, পাবদা, ফলি, মেনি)	১৯৩৩৩৫ টি (গইন্না, রুই, সরপুটি, কালিবাউস, চাপিলা, শোল, বাচা, গোলসা, পাবদা, মেনি, গজার)
জ. মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ সম্পর্কিত	এলাকায় সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের তত্ত্বাবধানে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের ধারা সমূহ বাস্তবায়ন। সম্পদ ব্যবহারকারীদের মৎস্য সংরক্ষণ আইন মেনে চলা। যেমন- অভয়াশ্রমে মাছ না ধরা; ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ না ধরা, ধ্বংসাত্মক মৎস্য সরঞ্জামাদি ব্যবহার না করা (যেমন- কারেন্ট জাল) ইত্যাদি।		

২. জলজ সম্পদের অতিরিক্ত আহরণ হ্রাসের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	হাইল হাওর (শ্রীমঙ্গল)	তুরাগ-বংশী (কালিয়াকৈর)	কংশ-মালিঝি (শেরপুর)
গঠিত দলের সংখ্যা	৮৭ (পুরুষ ৫৬, মহিলা ৩১)	৫১ (পুরুষ ৩৪, মহিলা ১৭)	১০৮ (পুরুষ ৭৮, মহিলা ৩০)
মোট দলের সংখ্যা	১,৯০৫ (পুরুষ ১১৮৪, মহিলা ৭২১)	১০৭০ (পুরুষ ৭০৯, মহিলা ৩৬১)	২৩৫৯ (পুরুষ ১৬৬৭, মহিলা ৬৯২)
দলের সঞ্চয়	২০.৪ লক্ষ টাকা	১২.১ লক্ষ টাকা	২৩.৬ লক্ষ টাকা
বিতরণকৃত ঋণ	৩.৮২ কোটি টাকা	১.৮০ কোটি টাকা	১.২২ কোটি টাকা
বিকল্প আয় বৃদ্ধি	৫২%	৫১%	৪০%

প্রকল্পের প্রভাব

ক. সম্পদ ব্যবস্থাপনায়

কার্যক্রম	হাইল হাওর (শ্রীমঙ্গল)		তুরাগ-বংশী (কালিয়াকৈর)		কংশ-মালিঝি (শেরপুর)	
	প্রকল্প পূর্ব	বর্তমান	প্রকল্প পূর্ব	বর্তমান	প্রকল্প পূর্ব	বর্তমান
মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি	১৭১.০৮ কেজি/হেক্টর	৩৮৯ কেজি/হেক্টর	৫৭.৮০ কেজি/হেক্টর	৩২১ কেজি/হেক্টর	১৫০.১৬ কেজি/হেক্টর	৩১৬ কেজি/হেক্টর
মাছ খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি	৪৬.৯০ গ্রাম/জন/দিন	৫৯.৫৭ গ্রাম/জন/দিন	২৭.৩২ গ্রাম/জন/দিন	৪৭.০৬ গ্রাম/জন/দিন	২২.০০ গ্রাম/জন/দিন	২৭.৮৭ গ্রাম/জন/দিন
মাছের প্রজাতি বৃদ্ধি		৮টি প্রজাতি* (সরপুটি, ছটকা, চিংড়ি, গইন্না, আইর, রুই, কালিবাউস, পাবদা, মোয়া)	-	১০টি প্রজাতি * (মোলা পুঁটি, গইন্না, আইর, গুজি আইর/গুজাকাটা, পাবদা, ফলি, রুই, কালিবাউস, মেনি, গজার, চাপিলা)		১০টি প্রজাতি* (মেনি, বজরী, টেংরা, সরপুঁটি, চাপিলা, শোল, গজার, গইন্না, পাবদা, রুই, কালিবাউস)

* পূর্বে সংশ্লিষ্ট জলাভূমিতে এসব প্রজাতির মাছের প্রাপ্তি অত্যন্ত কম ছিল। পোনা মজুদসহ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে এ সব প্রজাতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো প্রত্যক্ষ ভাবে উল্লেখিত প্রতিটি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। তারা অভয়াশ্রম রক্ষা, মৎস্য আহরণে যুক্তিসংগত নিয়ন্ত্রণ, মাছের প্রজননকালে বছরের নির্দিষ্ট মাসগুলোতে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা, ক্ষতিকর মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ ছাড়াও এই সংগঠনগুলো সমাজের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে সচেতন করার পদক্ষেপ নেয়। আরএমও কর্তৃক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ফলে সম্পদের যে উন্নয়ন হয়েছে বা মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে তার সুফল পার্শ্ববর্তী জলাভূমিতেও বিস্তৃত হয়েছে কারণ আরএমও কর্তৃক ব্যবস্থাপনাধীন জলাভূমি শত শত হেক্টর বিস্তীর্ণ একটি জলাভূমিরই অংশবিশেষ।

প্রতিটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্ধারিত এলাকা রয়েছে। এ সব এলাকার রাস্তা ও ছড়া বা ঝরার ধারে প্রকল্পের সহায়তায় তারা বনজ, ফলজ ও ওষধি জাতের নানা বৃক্ষ রোপন করে ভূমি ক্ষয় রোধের বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। ভবিষ্যতে সংগঠনগুলো এ সব বৃক্ষের বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৪০ শতাংশ পাবে, যা তাদের সংগঠনের ব্যয় নির্বাহ ছাড়াও সম্পদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে পারবে।

খ. সম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে

এ পর্যন্ত প্রকল্প থেকে ৩৫টি পেশায় ৫,৩৩৪ জনের অধিক সংগঠিত সম্পদ ব্যবহারকারীদের মধ্যে মোট ১১,০৩০ টি ঋণের মাধ্যমে ৬.৮৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৫৬.১০ লক্ষ টাকা দাড়িয়েছে। প্রকল্প এলাকায় দৈনিক মাছ ধরার চাপ কমেছে ২০-৩০% এবং প্রায় ১০% মৎস্যজীবী মাছ ধরা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। দু'টি এফআরইউজি-কে (সংগঠনকে) পরীক্ষামূলকভাবে ৪০ লক্ষাধিক টাকার তহবিল হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সংগঠনের নীতিমালা অনুযায়ী তহবিল পরিচালনাসহ সকল প্রকার সাংগঠনিক কার্যক্রম তারা নিজেরাই চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রকল্পোত্তর টেকসই ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প মেয়াদ শেষেও আরএমও ও এফআরইউজি জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাজে সম্পৃক্ত থাকবে। ঐ সময় এসব কার্যক্রম উপজেলা ফিশারিজ কমিটি বা স্থানীয় সরকার কমিটির তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। প্রতিটি এফআরইউজি তাদের নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এ ব্যবস্থাপনায় সরকার প্রদত্ত এনডওমেন্ট ফান্ডও ব্যবহৃত হবে।

উপসংহার

আমাদের দেশের জলাভূমিগুলো সম্পদে পরিপূর্ণ। এসব জলাভূমির উপযুক্ত পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে একদিকে পরিবেশের বিপর্যয় নেমে আসছে, অন্যদিকে জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল এলাকার জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্রমেই এক সংকটজনক পর্যায়ে পৌছাচ্ছে। মাচ প্রকল্প সমাজভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আমাদের জলাভূমির সমৃদ্ধি ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে।

সমাজভিত্তিক এ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দেশের সম্ভাবনাময় অন্যান্য জলাভূমিতে প্রবর্তন করলে ক্রমানুয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই জলাভূমি সম্পদের অবক্ষয় রোধসহ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ
(Flood Plain Aquaculture)

ফেরদৌস আরা বেগম
মহা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন

Abstract

Technology of fish culture in flood plain is very new in Bangladesh. During rainy season, most of the wetlands and other low laying areas become inundated lasting for 3-5 months. For this reason, single crop of rice is practiced in those flood plain areas. Normally flood plains are with golden rice crop. But a different scenario were seen in one flood plain under Daudkandi Upazila of Comilla district. Instead of paddy cultivation, fish culture is practicing in that flood plain area under a project named "Pancouri". 'Paancouri' flood plain aquaculture project is producing huge quintiles of Koi, Boal, Shoal, Magur, Shrimps, Pabda, Roi, Catla, Chital fish etc. The management planning, investment system, financial responsibilities, implementation process and community awareness are excellent at pancouri flood plain aquaculture project. Nine hundred bighas of water body are under the project. Pancouri project earned annually near about Tk. one core by investing only Tk. 12 lac to 15 lac. Investment cost is incurred from the beneficiary of their own without any external support. Pancouri flood plain aquaculture project is based on community approach. As responsibilities are sharing within the communities and benefits are distributed on the basis of equity, there is no scope for fish poaching or any other system losses. This flood plain aquaculture practice lasts for 4-5 months. The communities are not benefited only from fish produced but they are also engaged in preparing fish feed, supplying of ice, transportation of fish and production of fingerling from where they also make income.

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের প্রযুক্তি বাংলাদেশে খুবই নতুন। সাধারণতঃ বর্ষা মওসুমে বাংলাদেশের অধিকাংশ জলাভূমি এবং নীচু অঞ্চল পানিতে ডুবে যায়। এ পানি সরে যেতে সময় লাগে ৩-৪ মাস। এ কারণে প্লাবন ভূমিতে প্রধানতঃ এক ফসলি শস্যের আবাদই হয়ে থাকে। বন্যা বিধৌত এ ভূমির আর কোন উৎপাদনশীল ব্যবহারের সুযোগ নেই।

উল্লেখিত কারণে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের কথা শুনে খুবই আগ্রহ বোধ করলাম। এক সকালে রওনা হলাম কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার "পানকৌড়ি" প্রকল্পটি সরেজমিনে দেখার জন্য। প্রকল্প এলাকায় পৌছে হতবাক হবার পালা। রাশি রাশি ভরা ভরা সোনালী ধানের কথা শুনেছি। কিন্তু বিশাল প্রাঙ্গন জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির হাজার হাজার মাছের সমারোহ কখনো দেখিনি। কৈ, বোয়াল, শোল, মাগুর, চিংড়ি, পাবদা, রুই, কাতল, চিতল আরও অজস্র প্রজাতির ছোট বড় মাছের বিশাল আয়োজন। এ যেনো সত্যিকার এক রূপালী বিপ্লব। ভরা মৌসুমে প্রতিদিন ট্রাক ভর্তি টন টন মাছ যায় বিভিন্ন শহরের বাজারে।

কি করে সম্ভব হলো এই বিপ্লব? এই প্রকল্পের কৌশলগত পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, আর্থিক দায়-দায়িত্ব, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি সমাজ সচেতনতা বোধ দেখে চমকিত হলাম। প্রায় নয়'শ বিঘা জমিতে বিনিয়োগ মাত্র ১২ থেকে ১৫ লাখ টাকা। লাভ প্রতি মৌসুমে প্রায় কোটি টাকার কাছাকাছি। কোন ঋণ নেই। বিদেশী সাহায্য নেই। একক বিনিয়োগের সুযোগ নেই। সমাজ ভিত্তিক সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তিতে এলাকার সকল পরিবারের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এই প্রকল্প। প্রকল্প এলাকায় আসতে আসতে পথেই পড়ে ছিল ছোটখাট একটি জলা। এখানেও মাছের চাষ হয়। চেয়ারম্যান সাহেবের খামার। শুনলাম, এখানে নাকি প্রায়ই মাছ চুরি হয়। বিষ দিয়ে মাছ মারার ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ এলাকায় কখনো মাছ চুরি যায় না। বিষ প্রয়োগের ঘটনাও কখনো ঘটেনি। কারণ এখানে কোন একক মালিকানা নেই। প্রকল্প এলাকার সকল পরিবারই এই খামারের মালিক। সর্বোচ্চ বিশটির বেশী শেয়ার কেনার সুযোগ নেই কোন পরিবারের। প্রজেক্ট ডকুমেন্ট এভাবেই তৈরী করা হয়েছে। ভরা বন্যায় প্রতিটি পরিবার নিজেরাই তাদের খামারের নিজস্ব এলাকাতে বাঁধ উঁচু করে দেয়। বাঁশের বেড়া, খুটি লাগায়। নেট দিয়ে ঘিরে রাখে, যাতে মাছ ভেসে যেতে না পারে। বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত জুড়ে বন্যার পানি আটকে রেখে করা হয়েছে এই মাছের চাষ। মাছের বয়স এবং

ওজন অনুযায়ী নিয়ম মতো মাছকে খাদ্য দেয়া হয়। ধীরে ধীরে পানি কমতে থাকে, মাছ ও তোলা শুরু হয়। কয়েক মাস জুড়ে প্রতিদিনই চলে প্রচুর মাছ ওঠানো এবং মার্কেটিং করার পালা।

ধীরে ধীরে পানি একেবারে সরে গেলে মাছের খাবার, ওয়েষ্ট এবং পানি বিধৌত নরম জমিতে পুঁতে দেয়া হয় ধানের চারা। এ জমিতে ধান বোনার জন্য কোন চাষের প্রয়োজন হয় না অথচ ধানের ফলন হয় প্রচুর।

প্রকল্প এলাকার জনগণ যৌথভাবে শুধু মৎস্য খামারের মালিকানাই নয়, আরও বিভিন্নভাবে এই মৎস্য চাষ থেকে আয় করে থাকে। যেমন ফিসফিড তৈরী, বরফ সরবরাহ, ট্রান্সপোর্ট সরবরাহ, মাছের পোনা তৈরী ইত্যাদি বিবিধ কাজ থেকেও অর্থ উপার্জন করে থাকে তারা।

তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্র্য দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি এবং প্রোটিন ঘাটতি দূরীকরণে প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষের বিকল্প নেই। গ্রাম এলাকায় গরীব প্রান্তিক চাষি এবং হতদরিদ্র মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প রয়েছে। এতে অনেক প্রান্তিক হতদরিদ্র জনগণ নিজেদের অবস্থান উন্নয়নের চেষ্টা করে উপকৃত হচ্ছে।

কিন্তু প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের প্রকল্পের সাথে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের পার্থক্য হচ্ছে, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে সকলেই ঋণী। কখনো এই ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে ঘরের গরু, ছাগল বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু প্লাবন ভূমিতে মাছচাষ প্রকল্পের প্রান্তিক জনগণ কেউই ঋণী নয়। সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের ক্ষুদ্র তহবিল বা জমির হিসেবেই প্রকল্পে তাদের মালিকানা নির্ধারিত হয় এবং সেই অনুযায়ী প্রকল্পের সব ধরণের লাভের শেয়ার তারা পায়।

এই প্রকল্পের প্রধান সমন্বয়কারী জনাব সাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ জানালেন, এই প্রকল্পের অংশীদার পরিবারগুলো শুধু অর্থকারী দিক নিয়েই ভাবিত নয়, প্রকল্পে রয়েছে পুষ্টি সচেতনতাবোধ, এইডস, নারী-শিশু পাচার, নারী নির্যাতন এবং বাল্য ও নারী শিক্ষা বিষয়েও ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

প্লাবন বিধৌত বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে এ ধরণের সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প গড়ে উঠলে একদিকে যেমন- দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper) এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (Millennium Development Goals) এর লক্ষ্য অনুযায়ী দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে, অপর দিকে পুষ্টি ঘাটতি দূর করাও সম্ভব হবে।

প্লাবন ভূমিতে ধান ও মাছ উৎপাদনে স্লুইস গেটের ব্যবহার
(Use of Sluice Gate for Rice and Fish Production in Modified Floodplains)

মোঃ লিয়াকত আলী ও সরদার সফিকুল আলম
বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস)

Abstract

Floodplains play a vital role in the inland fisheries production system and support livelihoods of the rural poor. During rainy season many wild fish species migrate to the floodplain from the main river to spawn and feed offering productive fisheries opportunity. But due to construction of embankment, regulator and sluice gates under FCD / FCDI projects for increasing rice production, the floodplain fisheries have declined and biodiversity have been affected. Livelihoods of the poor fishers have been affected and nutritional level to rural people has dropped, although the FCD / FCDI programmer have produced significant benefit to farmers. Rice production has increased sufficiently leading the country to self-sufficiency in food production. The sluice gate / regulators are mainly used to control water within the FCD project areas for rice production only. Studies have shown that the fish can enter the modified floodplain area and through proper management and operation of sluice gates fish stock could be enhanced in the modified floodplain. But information and guidelines on how best to operate the sluice gate during hydrological cycle to increase in the recruitment are yet to be developed.

Therefore in order to develop guidelines / protocols for proper management and operation of sluice gates that would help enhance fish migration into the floodplains without any harm rice production, a DFID financed project entitled "The use of sluice gate for fish stock enhancement and diversification of livelihood" was undertaken during 2003 and 2004 by BCAS, IIED & MRAG, UK in two water management project areas namely RIPDP and CPP with 3 sluice gates. This paper highlights the key findings of the above study and the guidelines / protocols for management & operation of sluice gate for fish stock enhancement in the modified floodplains including key communication messages developed under another on going DFID funded project "Promotion of FMSP Guideline for Floodplains Fisheries Management and Sluice Gate Control". The key messages for management and operation of sluice gates/regulators for fish stock enhancement in the modified floodplain are:

(1) Sluice gates be opened to maximize inward flow of water during rising flood to facilitate migration of juvenile fish and spawning fish into the floodplain area
(2) Sluice gate be opened as frequently as possible & during early flood turbulence out side the gate be minimized.
(3) During ebb flood current velocity be controlled to enable the fish migrate against current.
(4) Crop diversification be practiced to introduce such crops as could be harvested before flood and crop requiring less irrigation water compared to rice.
(5) Fishing in the cannel/river linking main river with sluice gate be controlled / reduced as more than 50% of fishes are caught before they research the sluice gate.
(6) Sluice gate management committee need to be strengthened and be represented by more grass root level relevant stakeholders.
(7) Sluice gate specific operation guidelines be developed.

ভূমিকা

প্রাকৃতিকভাবে ধান ও মাছ উৎপাদনের অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ থাকায় ভাত ও মাছ বাংলাদেশের জনগণের প্রধান খাদ্য হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। অতীতে এদেশের অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমি ছিল অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র । দেশের মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় ৯০% পাওয়া যেত অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্লাবনভূমির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বর্ষা মৌসুমে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি প্লাবিত হয় এবং এক তৃতীয়াংশের বেশি ভূমি ৩-৫ মাস পানির নিচে থাকে। এই মৌসুমী প্লাবনভূমিতে পরিণত হয় বহুমুখী ও উৎপাদনশীল মৎস্য চারণক্ষেত্রে। তখন বহু প্রজাতির মাছ প্রজনন ও খাদ্য আহরণের জন্য এবং রেণু /পোনা খাদ্য আহরণের জন্য নদী থেকে প্লাবন ভূমিতে অভিগমন করে। এখানে এগুলো বৃদ্ধি পায়, কিছু আহরিত হয়, কিছু প্লাবনভূমি এলাকায় স্থায়ী জলাশয়ে থেকে যায় বা আটকা পড়ে যায় এবং কিছু বর্ষার শেষে নদীতে প্রত্যাগমন করে । এ ভাবেই প্লাবনভূমি ও নদীতে মৎস্য উৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

স্লুইস গেট নির্মানের পটভূমি

দেশে খাদ্যের ঘাটতি মেটাতে ষাটের দশকের দিকে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার কতৃক গৃহীত সবুজ বিপ্লবের আওতায় সারাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন কমসূচি গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত সারা দেশে ৬৫৩টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ সেচ ও পানি নিষ্কাশন প্রকল্প / কর্মসূচির আওতায় ১৩,০০০ কি. মি. বাঁধ ও ৪,১৯০টি স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়। ফলে প্রায় ৫.৫ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি উক্ত কর্মসূচির আওতায় এসেছে। এর ফলে যে জমিতে একটি ফসল উৎপাদন হত সেখানে একাধিক উচ্চ ফলনশীল ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হচ্ছে ।

অন্যদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, সেচ ও পানি নিষ্কাষন কার্যক্রমের ফলে প্রধান নদী হতে প্লাবনভূমিতে মাছের অভিগমন পথ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং জলাভূমির আয়তন হ্রাস পেয়েছে । এর ফলে ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে প্লাবনভূমি তথা সমগ্র অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের শনাক্তকৃত ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্য থেকে ৫৪টি প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত প্রায় বলে আই ইউ সি এন প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় । প্লাবনভূমি এলাকায় মাছ কমে যাওয়ায় দরিদ্র্য মৎস্যজীবীর আয় হ্রাস পেয়েছে ও জীবিকা ব্যাহত হয়েছে। গ্রামীণ অধিবাসীরা মাছের সহজ প্রাপ্যতা আহরণের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে ও তাদের মাছ খাওয়ার পরিমান হ্রাস পেয়েছে।

প্রধান নদীর সাথে বন্যা নিয়ন্ত্রিত প্লাবনভূমির সংযোগ খাল/নদীর উপর নির্মিত স্লুইস গেট দ্বারা প্রধানতঃ কৃষিকাজের জন্য পানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই সকল স্লুইস গেট পানি উন্নয়ন বোর্ড বা স্থানীয়ভাবে গঠিত স্লুইচ গেট কমিটি দ্বারা মূলত কৃষিকাজের সুবিধার্থে পরিচালনা করা হয়। সেই ক্ষেত্রে কখনই প্লাবনভূমিতে উৎপাদনযোগ্য বিশাল সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করা হয় না। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বন্য নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন কার্যক্রমের ফলে প্লাবনভূমি এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

১। বর্ষার প্রারম্ভে মাছের প্রজনন মৌসুমে স্লুইসগেট খোলা না থাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাহিরের নদী/অন্যান্য জলাশয় হতে মাছ ও পোনা প্রজনন বা খাদ্যের জন্য স্লুইস গেটের মধ্য দিয়ে প্লাবনভূমি এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না। অবশ্য অনিয়মিতভাবে কোন সময় গেট খোলার ফলে কিছু মাছ/পোনা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশ করে যা বিস্তীর্ণ প্লাবিত এলাকার জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল।

২। বন্যা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পানি নিষ্কাশন ও কৃষিতে সেচের ফলে জলাশয় সমুহ (নদী, খাল, বিল) শুকিয়ে যায়। প্রাকৃতিক উপায়েও জলাশয় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী বোরো ধান ক্ষেতে পানি সেচ দেওয়ার ফলেও জলাশয়গুলো প্রায় পানিশূন্য হয়ে মাছের আবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। পরবর্তী প্রজনন মৌসুমে বংশ বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত / কোন মা মাছ থাকে না। ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রিত প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়। বর্ষা মৌসুমে প্রচুর পানি থাকলেও সেখানে পর্যাপ্ত মাছ থাকে না।

বন্যা নিয়ন্ত্রন, সেচ ও পানি নিষ্কাশন কার্যক্রমের ফলে প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন হ্রাসের বিষয় অনুধাবন করে দেশে কয়েকটি ফিসপাস ও মাছ বান্ধব স্লুইচ গেট তৈরি করা হয়েছে। এতে কিছু সুফল পাওয়া গেলেও বেশ কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং সেটি ব্যয় বহুলও বটে। অন্যদিকে বিদ্যমান গেটগুলো সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মাধ্যমে যদি ধানের কোন ক্ষতি না করে মাছের উৎপাদন বাড়ানো যায় তবে তা হবে সহজ, ব্যয়হীন ও সমধিক গ্রহণযোগ্য। সম্প্রতি পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, স্লুইস গেট পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ধানের উৎপাদনের ক্ষতি না করেও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

প্লাবনভূমির মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও স্লুইস গেটের ব্যবহারঃ সমীক্ষা ও সফলতা

সমীক্ষা

স্লুইস গেট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কি ভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ধান উৎপাদনের পাশাপাশি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তার ওপর ২০০৩-২০০৪ সালে বৃটিশ সরকার (DFID)-এর আর্থিক সহায়তায় *"বন্যা নিয়ন্ত্রিত প্লাবনভূমি এলাকায় মাছের মজুদ বৃদ্ধি ও জীবিকার বৈচিত্র্য আনয়নে স্লুইস গেটের ব্যবহার (The use of Sluice Gate for Fish Stock Enhancement and Diversification of Livelihoods)"* শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এক সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষাটি যৌথভাবে Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS) ও দুটি বৃটিশ সংস্থা কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত হয়। সমীক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল স্লুইস গেটের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ধান উৎপাদনের ক্ষতি না করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্লুইস গেট পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়ন করা। পাবনা জেলায় অবস্থিত "পাবনা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প" এলাকায় দুইটি স্লুইস গেট (তালিমনগর ও বাগুলাখোলা স্লুইস গেট) এবং টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত "কম্পার্টমেন্টেলাইজেশন পাইলট প্রজেক্ট" এলাকায় একটি স্লুইস গেট (যুগনি স্লুইস গেট) কে কেন্দ্র করে উক্ত সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষায় স্লুইস গেটের উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত প্লাবনভূমির ভিতরে ও বাহিরে সংযোগ-খালে মৎস্য আহরণ পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ এবং মাছ চিহ্নিতকরণ ও পুনঃ আহরণ (Mark and recapture method) কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে স্লুইচ গেটের ভিতর দিয়ে মাছের অভিগমনের সম্ভাব্যতা, সফলতা ও হার নির্ণয়; অভিগমনের সময় নির্ধারণ এবং অভিগমনের সহিত স্রোতের গতি, প্রবাহ ও পানির ঘূর্ণায়নের সম্পর্ক নির্ণয়সহ স্লুইস গেট পরিচালনার বর্তমান ব্যবস্থা/ নিয়ম, সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়, মাছ ও ধান চাষে স্লুইস গেটের প্রভাব, চাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয় জানার চেষ্টা করা হয়। সমীক্ষার ফলাফল সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো।

সমীক্ষার ফলাফল

মাছের অভিগমন

মৎস্য আহরণ পর্যবেক্ষণ এবং মাছ চিহ্নিতকরণ ও পুনঃ আহরণ তথ্য হতে দেখা যায় যে, স্লুইস গেটের ভিতর দিয়ে মাছ অভিগমন করতে সক্ষম। প্রথম বন্যার সময় (জুন-জুলাই) পানি যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন প্রজননক্ষম মাছ ও রুইজাতীয় মাছের পোনা স্লুইস গেটের ভিতর দিয়ে প্লাবনভূমির দিকে স্রোতের অনুকূলে অভিগমন করে। বন্যার পানি হ্রাসের সময় নদীভিত্তিক মাছগুলো স্লুইস গেট দিয়ে বের হয়ে বড় নদীর দিকে অভিগমন করে।

জুন-জুলাই মাসে বন্যার সময়ে পরিপক্ক ও অপরিপক্ক উভয় প্রকার মাছই স্রোতের অনুকূলে প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করে। এ সময় অধিকাংশ মাছই প্রজননক্ষম থাকে যা প্লাবনভূমিতে প্রজনন করে মাছের মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে। পোনা ও রেণু প্লাবনভূমির খাদ্য-প্রাচুর্যে অল্পসময়ের মধ্যে বড় হয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। কাজেই প্রথম বন্যার সময় প্লাবনভূমিতে মাছের অভিগমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্ষার শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর) যখন পানি স্লুইস গেটের ভিতর দিয়ে বাহিরের দিকে প্রবাহিত হয় তখন স্রোতের বেগ বেশী থাকায় অনেক প্রজাতির মাছই স্রোতের প্রতিকূলে প্লাবনভূমির দিকে যেতে পারে না।

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, স্লুইস গেটের মধ্য দিয়ে মাছের অভিগমনের সফলতা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথা স্লুইস গেট খোলার পরিমাণ, স্রোতের গতি, পানির চাপ, পানির প্রবাহ, পানির ঘূর্ণয়ন এর সহিত সম্পর্কযুক্ত। স্লুইস গেট খোলার পরিমাণ ও ভিতরের দিকে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির সংগে সংগে স্রোতের অনুকূলে মাছের অভিগমনের সফলতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বাহিরের দিকে পানির স্রোতের গতি ও ভিতরের দিকে প্রবাহের সময় পানির ঘূর্ণায়ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিগমনের সফলতা হ্রাস পায়।

মাছ চিহ্নিতকরণ ও পুণঃ আহরণ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বর্ষার শেষে পানি যখন দ্রুত গতিতে গেট দিয়ে বাহিরের দিকে প্রবাহিত হয় তখন প্লাবনভূমির দিকে মাছের অভিগমনের সফলতা অতি নগণ্য, যদিও স্লুইস গেটের বাহিরে অনেক মাছ ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা কালে ধরা পড়ে। স্রোতের বিপরীতে মাছের সাতার কাটার ক্ষমতার চেয়ে স্রোতের গতিবেগ বেশি থাকায় স্রোতের বিপরীতে মাছগুলো সাঁতার কেটে অভিগমন করতে পারে না। এসময়ে স্রোতের বেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে প্লাবনভূমির দিকে মাছের অভিগমন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

স্রোতের বেগ সর্বাধিক কত থাকলে স্রোতের প্রতিকূলে মাছ সাঁতার কেটে যেতে পারবে তা নিম্নোক্ত ফরমূলার সাহায্যে নির্ণয় করা যেতে পারে। পরীক্ষা-নীরিক্ষায় দেখা গেছে যে, স্রোতের বেগ প্রতি সেকেন্ডে $^{১}/_{১০}$ মিটার (১০ সে.মি.) হলে স্রোতের প্রতিকূলে অধিকাংশ মাছ অভিগমন করতে পারে।

$$\text{Max Outflow Velocity} < U_{ms} = \frac{L\,[n\,\{1.1\,(W)\}^{-0.14})]}{100}$$

Where U_{ms} = maximum sustainable swimming speed, L = mean length of migrating fish, W = mean weight of migrating fish, n = constant = 3

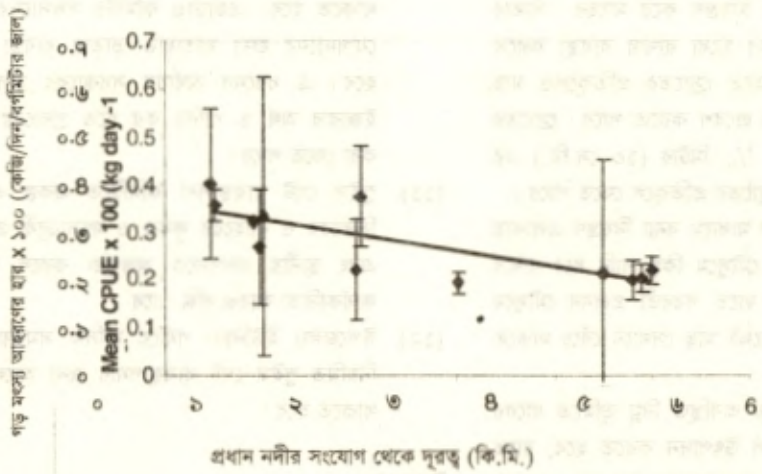

চিত্র : ১ প্রধান নদীর সাথে স্লুইস গেট সংযোগকারী নদীর গড় মৎস্য আহরণ হ্রাস

মৎস্য আহরণ পর্যবেক্ষণ (Catch monitoring) তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রধান নদীর সহিত স্লুইস গেটের সংযোগ খাল/ নদীতে ৫০% এর বেশী মাছ স্লুইচ গেটের নিকট পৌছানোর পূর্বেই ধরা পড়ে যায় । পাবনা সেচ প্রকল্প এলাকায় তালিমনগর স্লুইস গেটের সহিত যমুনা নদীর সংযোগ খালে মৎস্য আহরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই ফল পাওয়া গেছে (চিত্র-১)।

স্লুইস গেট পরিচালনা

সমীক্ষাধীন ৩টি গেটের মধ্যে ১টিতে (তালিমনগর গেট) স্লুইস গেট পরিচালনার জন্য স্লুইস গেট পরিচালনা কমিটি আছে। অপর ২টিতে কোন কমিটি নেই। স্থানীয় চাহিদা অনুসারে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এটি পরিচালিত হয়। গেট পরিচালনার জন্য কোন প্রকার নীতিমালা নেই। মূলত কৃষকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিটি গেট খোলা বন্ধের সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে । এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে কমিটির সদস্যরা বেশীরভাগই অনুপস্থিত থাকে। গেট পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সঠিকভাবে মনিটরিং না হওয়ায় ও কমিটির সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে গেট পরিচালনা দ্বারা পর্যাপ্ত সুফল পাওয়া যায় না। প্রকল্প এলাকায় জমির উচ্চতা অনুসারে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসলের জন্য এলাকাভেদে কৃষকদের পানির প্রয়োজনীয়তা ভিন্নতর। আবার মৎস্যজীবীদের জন্য বেশী পানির প্রয়োজন। ফলে সুবিধাভোগীদের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত সৃষ্টি হয়। প্রভাবশালীদের মধ্যে নিজেদের সুবিধার্থে স্লুইচ গেট পরিচালনায় প্রভাব খাটানোর প্রবণতা রয়েছে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকল সুফলভোগীদের অংশগ্রহনের ভিত্তিতে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন।

প্লাবনভূমিতে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা ও সুপারিশমালা

(১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকায় বাহির হতে মাছের অভিগমন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথম বন্যার সময় (মে-জুন) স্লুইস গেট খুলে রেখে অধিক পরিমাণ পানি ঢুকাতে হবে।

(২) প্রথম বন্যার সময় গেট বার বার খুলতে হবে এবং গেটের বহিরে পানির ঘূর্ণায়ন হ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে যাতে মাছ সহজে স্লুইস গেটের ভিতর দিয়ে জীবিত অবস্থায় প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করতে পারে।

(৩) বন্যার শেষের দিকে যখন পানি বের করে দেওয়া হয় তখন স্রোতের গতি নিয়ন্ত্রণ করে মাছের সাঁতার কাটার সর্বোচ্চ গতির মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বাহির হতে স্রোতের প্রতিকূলেও মাছ প্লাবন ভূমি এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। স্রোতের গতি প্রতি সেকেন্ডে $^{১}/_{১০}$ মিটার (১০ সে.মি.) এর মধ্যে থাকলে মাছ স্রোতের প্রতিকূলে যেতে পারে।

(৪) স্লুইস গেট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকায় খালে ও বিলে শুষ্ক মৌসুমে কিছু পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরবর্তী প্রজনন মৌসুমে বংশবিস্তারের জন্য যথেষ্ট মাছ সেখানে বেঁচে থাকতে পারে।

(৫) বন্যানিয়ন্ত্রণ এলাকায় অবস্থিত নিম্ন ভূমিতে ধানের পরিবর্তে এমন ফসল উৎপাদন করতে হবে, যাতে প্রথম বন্যার পূর্বেই তা আহরণ করা যায়। এ সব ফসল উৎপাদনের জন্য বোরো ধানের মত অধিক পানি সেচের প্রয়োজন হয় না ফলে এসব জলাশয়ে শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি ও মাছের মজুদ থাকবে।

(৬) প্রধান নদীর সহিত স্লুইস গেট সংযোগ খালে প্রথম বন্যার সময় মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করতে হবে। এর ফলে স্লুইস গেটের ভেতর দিয়ে অধিক পরিমাণ মাছ / পোনা প্রজনন বা খাদ্য আহরণের জন্য প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে।

(৭) মৎস্য আইন প্রয়োগ করতে হবে। মাছের ডিম ও পোনা ধরা প্রতিরোধ করতে ক্ষুদ্র ফাঁসের জাল ব্যবহার ও সেচের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করে বিল/খাল/নদী শুকিয়ে মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে।

(৮) বিল ও প্রধান নদীগুলোতে মাছের অভয়াশ্রম গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনবোধে পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া সংযোগ নদী / খাল ও বিল পুন:খনন করে মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি করতে হবে।

(৯) স্লুইস গেট কমিটিকে সক্রিয় করে তুলতে হবে।

(১০) স্লুইস গেট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা থাকতে হবে। এছাড়াও কমিটির সদস্যদের সভায় যোগদানের জন্য যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের অর্থায়ন সরকারের জলমহলের ইজারার অর্থ ও পানির কর হতে প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(১১) স্লুইস গেট ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রকল্প এলাকার ভিতরের ও বাহিরের কৃষক ও মৎস্যজীবী প্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগনকে অন্তর্ভুক্ত করলে কমিটির কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

(১২) উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিত স্লুইস গেট ব্যবস্থাপনার জন্য আলোচ্যসূচি থাকতে হবে।

উপসংহার

দেশের ৬৫৩টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন প্রকল্প এলাকায় স্লুইস গেটের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রিত প্লাবনভূমি তথা অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ফলে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ করা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে।

মাৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষা ঃ মাধ্যম দূর শিক্ষণ
(Fisheries Education : Distant Learning)

ড. মোঃ শাহ আলম সরকার
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract
Bangladesh is a densely populated country and 63% of animal protein comes from fishes. Thus fish culture becomes important to the large population of this country. They must be skilled with fisheries knowledge. The distant mode teaching method is very limited in Bangladesh. Distant education is urgently needed where it is possible to teach a huge population at a time. And only BOU has opened the door of distant education. Since 1997 this teaching method has been successfully conducting under BOU guidance. If the trained manpower are provided with credit or loan from the Govt. or private sectors, it may help to reduce the prevailing unemployment problem and to create an opportunity for income generating activities.

ভূমিকা
বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান ও নদীমাতৃক দেশ। এদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর- বাঁওড় পুকুর, ডোবা ইত্যাদি জলাশয়ে রয়েছে নানা প্রজাতির মৎস্য সম্পদ। এদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় এ মৎস্য সম্পদ সীমিত। তাই মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য মৎস্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে এদেশের মৎস্য উৎপাদনের যেমন বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে, তেমনি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দেশের বিশাল জনগণকে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেয়া। এ বিপুল জনগণ দারিদ্র্য ও নানা প্রতিকূলতার কারণে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দারিদ্র্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, অভিভাবকদের সঠিক দিক নির্দেশনা, অভাব ইত্যাদির কারণেও এদেশের মানুষ যথাসময়ে উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দূরশিক্ষণের মাধ্যমে যেহেতু ঘরে বসে যে কোন বয়সে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব তাই এটি বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা লাভ করার ক্ষেত্রে একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রচলিত ব্যবস্থা
প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট ক্যাম্পাসে উপস্থিত থেকে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুসারে শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ করেন। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর নৈকট্য এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষক এখানে শিক্ষার্থীর সামনে সরাসরি পাঠ উপস্থাপন করেন এবং শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ফিডব্যাক পেয়ে থাকেন।

দূরশিক্ষণের (Distant Education) বৈশিষ্ট্য
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে সরাসরি পাঠদান করেন না।
- শেখার কাজটি শিক্ষার্থী নিজেই করেন।
- বিশেষভাবে লেখা কোর্স বইগুলো শিক্ষকের কাজ করে।
- অন্যান্য সামগ্রী যেমন শিক্ষার্থী নির্দেশিকা অডিও ক্যাসেট শিক্ষার কাজে সাহায্য করে।
- উপরোক্ত শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন শিক্ষার্থী মূলত এগুলোর সাহায্যেই শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।
- পাঠের সময় ও স্থান শিক্ষার্থী নিজের সুবিধা মত ঠিক করেন।
- পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে টিউটোরিয়াল সেন্টারে সমস্যা ভিত্তিক আলোচনা ও নির্দেশনার ব্যবস্থা করা হয়।
- টিউটরগণ শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুসারে সাহায্য প্রদান করেন।

দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণত আনুষ্ঠানিক (Formal) এবং অনানুষ্ঠানিক (Non-Formal Education) শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সাধারণত বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, অডিও ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে মৎস্যবিষয়ক জ্ঞান দান করা হয়ে থাকে। দূরশিক্ষণের মাধ্যমে যে কোন বয়সের যে কোন পেশার লোক ঘরে বসে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম।

তাই দূরশিক্ষণের মাধ্যমেই একমাত্র দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণকে অল্প সময়ে দক্ষ জনবল হিসেবে তৈরি করা সম্ভব। আর এসব জনবল যখন মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি মাছ চাষ, মাছের পোনা উৎপাদন, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই মাছের উৎপাদন বাড়বে। এতে দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ঘটবে এবং সাথে সাথে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই আমরা বলতে পারি মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান লাভে দূরশিক্ষণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণের মাধ্যমে এদেশের বিপুল জনগণকে মৎস্য বিজ্ঞানে জ্ঞান দানের জন্য তথা মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে। ১৯৯২ সালের ২০শে অক্টোবর জাতীয় সংসদের পাশকৃত এক আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। যাত্রা শুরুর পর থেকে বাউবি বিভিন্নভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনবল তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাউবি কর্তৃক সম্প্রচারিত বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর মাধ্যমে মৎস্য বিষয়ক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক জনগণ নিজ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও ঘরে বসে নিজ নিজ কাজের পাশাপাশি মৎস্য বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে এরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছেন, বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে এরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে ব্যাচেলার অব এগ্রিকালচারাল এডুকেশন নামে একটি প্রোগ্রাম চালু করেছেন যা সম্পূর্ণরূপে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করে আসছে। উক্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলের সকল পেশার সকল বয়সের ছাত্র/ছাত্রী নিজ এলাকায় থেকেই মৎস্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৯ ক্রেডিটের জন্য ৪টি কোর্স বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করছে। বর্তমানে উক্ত প্রোগ্রামের ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৫০০ জন। উক্ত প্রোগ্রামটি সম্পাদনকারীরা ভবিষ্যতে দক্ষ জনবল হিসেবে দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়াও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সমগ্র অঞ্চলে বেকার যুবক/যুব মহিলাসহ দেশের সকল শ্রেণীর লোকদেরকে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে সার্টিফিকেট ইন পিসিকালচার এন্ড ফিশ প্রসেসিং (সিপিএফপি) নামে একটি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম জুলাই '৯৮ সালে চালু করেছে। এ প্রোগ্রামটির মেয়াদ ৬ মাস। প্রোগ্রামটি মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন তাদের নিকটস্থ টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে মৎস্য বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। কোর্সটি সমাপ্তকারীরা দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ প্রোগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রচার করা হচ্ছে বিধায় প্রোগ্রামের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ছাড়াও অন্যান্য সকল জনগণই ঘরে বসে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে মৎস্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হচ্ছেন। একমাত্র দূরশিক্ষণের মাধ্যমেই একজন মৎস্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ একই সাথে লক্ষ লক্ষ জনগণকে মৎস্য বিষয়ে জ্ঞান দান করতে সক্ষম হন।

শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ভিন্নধর্মী ও বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। দূর শিক্ষণে দক্ষ, মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে একই সাথে একই ভাষাভাষির জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা যায় অথচ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র সীমিত কতিপয়ের মাঝে শিক্ষার আলো পৌঁছানো সম্ভব। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ, ডাকব্যবস্থা, রেডিও, টেলিভিশন, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট প্রভৃতি প্রযুক্তির মাধ্যম শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে। বাংলাদেশের মতো জনবহুল অথচ উন্নয়নশীল দেশে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ সামগ্রী প্রদান এবং পরবর্তীতে টিউটোরিয়াল সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়।

পাঠসামগ্রী

ভর্তির সময় প্রতিটি কোর্সের জন্য বিষয় বিশেষজ্ঞ দিয়ে রচিত প্রশিক্ষণ উপযোগী পাঠ্যপুস্তক দেয়া হয়। এসব পাঠ্যপুস্তকে

এমনভাবে রচিত যেন ছাত্ররা নিজেদের ঘরে বসে নিজে নিজে পড়ে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। পাঠ্যপুস্তক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ব্যবহারিক

টিউটরগণের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজ নিজ পারিবারিক পরিবেশ, স্থানীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান এবং টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে ব্যবহারিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করে থাকে।

টিউটোরিয়াল

ছাত্র-ছাত্রীরা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে পাঠ সংক্রান্ত যেসব সমস্যার সম্মুখিন হবেন তা সমাধানের জন্য নির্ধারিত টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ নিতে পারেন। টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে সপ্তাহের নির্দিষ্ট শুক্রবারে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

রেডিও ও টেলিভিশন

পাঠ্য সূচির অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল অংশের উপর মাঝে মাঝে রেডিও ও টিভি প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দিয়ে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা। আমাদের দেশে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান লাভের সীমিত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাতে নির্দিষ্ট বয়সের নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। এতে বিশাল জনগোষ্ঠী মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে যেকোন বয়সের যে কোন পেশার যে কোন লোককে এবং একই সাথে লক্ষ লক্ষ লোককে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করে শিক্ষিত করা সম্ভব। দেশের সর্বোচ্চ মেধাবী ও দক্ষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে একই সাথে লক্ষ লক্ষ লোককে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান প্রদানের ঘটানোর ক্ষেত্রে দূরশিক্ষণ পদ্ধতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষাদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী মড্যুলার পদ্ধতিতে লেখা বই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে লেখা হয় বিধায় নিজে অধ্যয়ন করে শিখে এবং রেডিও টিভি প্রোগ্রাম ও অডিও ভিডিও ক্যাসেট দেখে, শুনে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন।

দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে একজন বিশেষজ্ঞ, মৎস্য বিজ্ঞানী বা একজন মৎস্য বিষয়ক শিক্ষক নিকটস্থ নির্ধারিত টিউটোলিয়াল কেন্দ্রে ছুটির দিনগুলোতে (সাধারণত শুক্রবারে) শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত হন এবং তাদের সমস্যার সমাধান দেন। ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করে টিউটর তাদের ফিডব্যাক জেনে তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং পাঠ গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে থাকেন। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে সমগ্র দেশের মানুষ একই সাথে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম।

মৎস্য শিক্ষার সুযোগকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সারাদেশে বাউবি ১২টি আঞ্চলিক ও ৮০টি স্থানীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে। দুরশিক্ষণের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ উন্মোচন করার লক্ষ্যে বাউবিতে অদূর ভবিষ্যতে মাস্টার্স এবং পিএইচডি কোর্স চালু হতে যাচ্ছে। মৎস্য বিজ্ঞান বিষয়ে সফল শিক্ষার্থীদেরকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আর্থিক ঋণ দানের সুবিধা দেয়া হলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এবং বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়ক হবে।

বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে সুন্দরবন জলাশয়ের ভূমিকা
(Role of Waterbodies of Sundarbans in Enhancing Fisheries Resources of the Bay of Bengal)

জে, কে, বিশ্বাস
মোঃ রকিব উদ্দিন বিশ্বাস
মৎস্য অধিদপ্তর

Abstract

The mangroove forest and mudflats of Sundarbans provide breeding and nursery ground for a large proportion of both marine and freshwater fish and shellfish. Problems of fisheries in the Sundarbans are many folds. Of this, over fishing, unauthorized fishing and corruption are the major attributes. The recruitment of finfish, shrimps and macro-zooplankton which act as a component of food chain for another groups of aquatic animals will severely be hampered within the next few years as the consequences of extensive Bagda shrimp fry and others aquatic animals extraction from the Sundabans waters. At present, it is necessary to take prompt action for the proper conservation and management of the fisheries resources of Sundarban reserve forest and marine resources considering the values of the resources from the social, economical and ecological points of view. If mangrove and marine fisheries are properly manage, which can satisfy multiple needs on a sustainable basis.

ভূমিকা

হাওর বাঁওড় প্লাবনভূমি-মৎস্য চাষের সোনার খনি -২০০৫ সালে মৎস্য পক্ষের প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্যান্য বছরের শ্লোগানের তুলনায় এবারের বিষয়টি আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যে বিষয়ে এতদিন তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি সেটাই এখন জরুরী হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক সময়ে টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকির, হালদা নদীতে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং চাঁদপুরের নদী মোহনা অঞ্চলে জাটকা নিধন সফলভাবে বন্ধ করার ফলাফলের দিকে দেশবাসী এখন অনেক আশা নিয়ে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ে FAO কর্তৃক প্রদত্ত Code of Conduct for Responsible Fisheries বই এর মুখবন্ধের প্রথম প্যারার কিছু অংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য "The wealth of aquatic resources was assumed to be an unlimited gift of nature. However, with increased knowledge and the dynamic development of fisheries after the second world war, this myth has faded in face of the realization that aquatic resources, although renewable, are not infinite and need to be properly managed, if their contribution to the nutritional, economic and social well-being of the growing world's population is to be sustained." এই প্রেক্ষিতে হাওর-বাঁওড়ের সাথে সাথে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ ও এর অন্যতম প্রাকৃতিক নার্সারি সুন্দরবনের জলাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করার সময় এসেছে।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মৎস্য সেক্টর থেকে প্রতিবছর গড়ে ২,০০০ কোটি টাকার আর্থিক রপ্তানি আয় ছাড়াও আমাদের ভবিষ্যৎ পুষ্টি সরবরাহের প্রধান উৎস ১.৬৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট বঙ্গোপসাগরের বিশাল মৎস্য ভান্ডার। বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে আমাদের বর্তমান উৎপাদন যেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে তেমনি ভবিষ্যতের জন্য মৎস্য সম্পদও রক্ষা পাবে। রপ্তানিযোগ্য যেসব মৎস্য পণ্য আছে তার মধ্যে প্রধান পণ্যগুলি হচ্ছে হিমায়িত চিংড়ি, হিমায়িত সামুদ্রিক মাছ, ইলিশ, শুটকি মাছ, লবণাক্ত মাছ, হাঙ্গরের পাখনা ইত্যাদি। এই আইটেমগুলির মূল উৎসই বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ। একমাত্র চাষকৃত উৎপাদিত চিংড়ি বাদ দিলে আমাদের রপ্তানির প্রায় সব মাছ এর মূল উৎস বঙ্গোপসাগর। চিংড়ি চাষ করা হলেও এর মূল উপাদান চিংড়ির পোনা এবং ব্রুড চিংড়ির উৎসও বঙ্গোপসাগর। বিদেশে রপ্তানি ছাড়াও আমাদের দেশের পুষ্টি সরবরাহের একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে ইলিশ মাছ ও বিভিন্ন সামুদ্রিক/স্বল্প লবণাক্ত এলাকার (সুন্দরবন এলাকার)

মাছ। উপকূলীয় এলাকার সাধারণ জনগণ এই সম্পদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

বঙ্গোপসাগরের মৎস্য ও অন্যান্য জলজ সম্পদের ভান্ডার সম্পূর্ণরূপে উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক নার্সারীর উপর নির্ভরশীল। বঙ্গোপসাগরের প্রাকৃতিক নার্সারি হিসাবে খুলনা উপকূলে অবস্থিত সুন্দরবনের জলাশয়সমুহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সামুদ্রিক এবং ঈষৎ লোণাপানির অধিকাংশ মাছ ও জলজপ্রাণী তাদের জীবন চক্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ সুন্দরবনের জলাশয়ে অতিবাহিত করে। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে অধিকাংশ মাছ ও জলজপ্রাণী পূনরায় সাগরে প্রত্যাবর্তন করে।

প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনের মধ্যে অবস্থিত মৎস্য সম্পদের কি অবস্থা, তা কতটা অরক্ষিত, অবহেলিত এবং অব্যবস্থাপনার শিকার তা সাম্প্রতিক সময়ে উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কিছুটা জানা সম্ভব হয়েছে। সুন্দরবনের জলজ সম্পদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব আদায় ভিত্তিক। সুন্দরবনের জলজ সম্পদের ব্যবস্থাপনার চেয়ে জলজ সম্পদের বিনিময়ে রাজস্ব আদায় করাটাই মূখ্য উদ্দেশ্য। ফলে মৎস্য/জলজ সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সুন্দরবন রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বন বিভাগের প্রায় এক হাজারের অধিক লোকবল থাকলেও মৎস্য সম্পদ তত্ত্বাবধান, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের কোন লোকবল সেখানে নেই।

সুন্দরবনের আয়তন ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। এখানে জালের মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় নদী, খাল এবং ভরানী। এই জলরাশির আয়তন ১,৮৭৪ বর্গকিলোমিটার অর্থাৎ সুন্দরবনের প্রায় একতৃতীয়াংশ। এই বিস্তীর্ণ জলরাশি লবণাক্ত এবং ঈষ্যৎ লোণাপানির মাছের প্রজননক্ষেত্র এবং আবাসস্থল। সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদের ব্যাপ্তি বিশাল ও বিস্তৃত।

সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ ইনশোর এবং অফশোর ফিশারি এই দুভাগে বিভক্ত। অফশোর ফিশারি সমুদ্র তীরের ৩,১২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত। এ অঞ্চলে প্রধানত সেট ব্যাগ নেট (বেহুন্দি জাল) দ্বারা মৎস্য আহরণ করা হয়। ইনশোর ফিশারি বনাঞ্চলের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ৮১৭ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ব্যাপৃত। এই উপকূল অঞ্চলে প্রায় ৪৫০টি ছোট বড় নদী, খাল সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে ৪টি মোহনার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। সুন্দরবনের প্রধান নদী গুলি হচ্ছে,-পশুর, শিবসা, আড়পাঙ্গাসিয়া, আড়য়াশিবসা, বলেশ্বর, ভোলা, ভাঙ্গরা, চালকি, চুনার, দেকী, হরিণভাংগা, যমুনা, কালিন্দ্রী, কুঙ্গা, মালঞ্চ, রায়মহল, সুতারখালী, হংসরাজ, সেলা, ভদ্রা, চুনকুড়ি, দুধমুখী, ফিরিঙ্গীমারী, আন্দারমানিক, ডিঙ্গিমারী ইত্যাদি।

এই অঞ্চলে পেশাদার জেলের সংখ্যা ১লক্ষ ৯৯ হাজার। অপেশাদার বা মওসুমভিত্তিক পোণা আহরণকারী প্রায় ৫লক্ষ। খুলনা উপকূলীয় অঞ্চলের ১৩টি থানায় মোট ১০৮টি জেলে গ্রাম/পাড়া রয়েছে। এসব গ্রামে, মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা ৪,৩৯৭টি এবং মৎস্য আহরণে জড়িত রয়েছে ১০,২৫৭ জন। সুন্দরবন এলাকার মৌসুম ভিত্তিক মৎস্যজীবীদের ক্যাম্প/গ্রামের সংখ্যা প্রায় ১৪টি। গ্রামের/ক্যাম্পের নাম–সোনাচর, নারকেলবাড়ীয়া, অফিসকিল্লা, মাঝির কিল্লা, আলোর কোল, মানিক আলী, আমবাড়িয়া এবং দুবলারচর বা চরমেহেরআলী। এই গ্রামগুলি অবস্থান সুন্দরবনের দক্ষিণে উপকূল বরাবর। এই গ্রামগুলি প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত মাছ আহরণ ও শুকানোর কাজে কর্মচঞ্চল থাকে। এইগুলিকে অস্থায়ী মৎস্য ক্যাম্প/গ্রাম বলা হয়। এখানে মূলতঃ শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজই বেশী হয়।

বিগত কয়েক বছরে সুন্দরবনের মৎস্য উৎপাদনের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো-

অর্থ বছর	সাদামাছ (মেঃ টন)	বড় চিংড়ি (মেঃ টন)	ছোট চিংড়ি (মেঃ টন)	শুটকি (মেঃ টন)	ইলিশ মাছ (মেঃ টন)	কাঁকড়া (মেঃ টন)	চিংড়ি ও কাঁকড়া (মেঃ টন)	সর্বমোট উৎপাদন (মেঃ টন)	মোট রাজস্ব আদায় (টাকা) লক্ষ
১৯৯৭-৯৮	২৬৬৯	২৫৫	১০৯	৭০১	৪৪৪	৮৮০	৩৮৬	৫০৮০	৮৪৮৭১৩৮
১৯৯৮-৯৯	২১৫৯	২২২	১৬২	৫৬২	৩৭৬	৪৭০	৩৪৭	৩৯৭৩	৬৮০১৯৩৪
১৯৯৯-০০	২৩৫৮	২৩৯	১৬৩	৬৬৯	৩২১	৫৮৬	৩৯৯	৪৪১৯	৬৩৫২০৮৮
২০০০-০১	২০৬০	২২২	১৪৪	৭০৩	২৬৭	৪২৬	৪০১	৩৯২২	৫৮৬৪৪৮১
২০০১-০২	১০৩২	২১২	১৯৬	৬০১	৩৩৬	৩১১	১২৯৭	২৯৬৩	৪৯৪৩৪৮৬
২০০২-০৩	৭২৪	৪৩৬	২১২	৪৯০	১৯০	১৬৭	১৫১০	৩৪২৯	৫৭২০৯৬৩
২০০৩-০৪	১৫১৭	১০০	৪৬	৪৫৪	২৮৬	২২৫	২১৪৩	৪৭৭১	৮৩৩৪০৫৩

তথ্য উৎস ঃ সুন্দরবন বিভাগ, খুলনা (মন থেকে মেঃ টনে রূপান্তরিত)

নিম্নলিখিত কারণে সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ, প্রজনন ক্ষেত্র এবং নার্সারি গ্রাউন্ডগুলি ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে

১. বহু পূর্ব হতে বনবিভাগ কর্তৃক প্রচলিত অপরিকল্পিতভাবে সুন্দরবনের জলাশয়ে মৎস্য আহরণের ছাড়পত্র প্রদান করা।
২. বেআইনিভাবে সুন্দরবনের জলাশয়ে মৎস্য শিকার করা।
৩. সুন্দরবন উপকূল এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, অশিক্ষা, অসচেতনতা ইত্যাদির কারণে উপকূলীয় নদী এবং মোহনায় মাছের অতি আহরণজনিত চাপ বৃদ্ধি।
৪. উপকূলীয় এলাকায় অবৈধ নেট জাল, চরঘেরা জাল এবং ছোট ফাঁসের বেহুন্দি জালের ব্যবহারে শিশু মাছের লালনক্ষেত্র সমূলে ধ্বংস হওয়া।
৫. প্রজননকালীন সময়/লালন সময় বিবেচনা না করে সারা বছর অবাধে মৎস্য আহরণ করায় মাছের জীবনচক্র ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া।
৬. প্রাকৃতিক উৎস থেকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে চিংড়ি পোনা আহরণের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়িসহ অন্যান্য উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মাছের পোনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া।
৭. অত্র এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ/প্রজাতি রক্ষায় কোন চিহ্নিত অভয়াশ্রম (নদী, খাল, খাড়ি ইত্যাদি) না থাকা।
৮. প্রতিবছর পলিমাটিতে নদী ভরাট হয়ে যাওয়া, বনভূমি উঁচু হওয়া এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে স্বাভাবিক জোয়ারভাটার কার্যকারিতা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়া।
৯. নদীতে মিষ্টি পানির প্রবাহ ক্রমান্বয়ে কমে যাওয়া।
১০. উজানে নদীর পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়া।
১১. অত্র এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ না হওয়া।
১২. সুন্দরবনের উপকূল অঞ্চল মৎস্য সম্পদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এখানে মৎস্য অধিদপ্তরের কোন ভূমিকা বা নিয়ন্ত্রণ না থাকা।

এছাড়া কয়েক বছর পূর্বে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষার ফলাফল হতে দেখা যায় যে, সুন্দরবন এলাকায় ১টি বাগদা চিংড়ি আহরণের সময় গড়ে ১১৯টি অন্যান্য চিংড়ির প্রজাতি, ৩১২টি ম্যাক্রোজুপ্লাংটন এবং ৩১টি অন্যান্য সাদা মাছ ধ্বংস হয়। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে ১টি বাগদা চিংড়ি আহরণের সময় ধ্বংস হয় গড়ে ৪৬টি অন্যান্য চিংড়ি প্রজাতি, ৩৫টি ম্যাক্রোজুপ্লাংটন, ১১টি সাদা মাছের পোনা। অর্থাৎ ১টি বাগদা পোনার জন্য সুন্দরবন উপকূল অঞ্চলে ধ্বংস হচ্ছে মোট ৪৬২টি মাছ, চিংড়ি এবং জুপ্লাংটন। সুন্দরবন অঞ্চল যে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের অন্যতম নার্সারি গ্রাউন্ড সেটা আহরিত বিভিন্ন পোনা এবং জুপ্লাংটনের সংখ্যা দেখলেই সহজে অনুমান করা যায়। এর মুল কারণ হল, হাজার হাজার বছর ধরে সুন্দরবনের ভিতরে অবস্থিত বিভিন্ন খাল, খাড়ি, নদী নালায় পতিত গাছের পাতা সহ অন্যান্য জীবের পচা অংশের প্রাচুর্য, লবণাক্ততার ভারসাম্য, জোয়ার-ভাটার প্রভাব, সহনীয় তাপমাত্রা সহ অন্যান্য জীববৈচিত্র।

এই প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের মৎস্য সেক্টর থেকে শুধুমাত্র বাৎসরিক ২কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে সুন্দরবন এলাকার জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপনসহ বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে গণ-সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ রক্ষা করা খুবই জরুরী। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক প্রজনন / লালনক্ষেত্র গুলি ধ্বংস হলে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এর ফলে মৎস্য সম্পদ নির্ভর জীবিকা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে।

মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে এবং মৎস্যজীবীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সুন্দরবন উপকূল এলাকার মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে গ্রহণযোগ্য সুপারিশমালা ঃ

১. মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবীদেরকে মাছ ধরার লাইসেন্স এবং পরিচয় পত্র প্রদানের মাধ্যমে মাছের অতি আহরণ এবং অবাধ আহরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
২. বৎসরে কমপক্ষে দুই মাস (মে/জুন) নেট জাল থেকে শুরু করে সমস্ত জাল দিয়ে খাল, নদী মোহনা এবং সমুদ্রে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করতে হবে। এর ফলে অন্ততঃ প্রজননকালীন সময়ে মা মাছ ও বাবা মাছ গুলি রক্ষা পাবে এবং সাগরে ফিরে গিয়ে বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পাবে।
৩. বিষ প্রয়োগে মাছ মারা, চর ঘেরা জাল, নেটজাল এবং সকল প্রকারের বেহুন্দি জাল সুন্দরবন এবং উপকুলবর্তী এলাকায় পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।
৪. সুন্দরবন এলাকার মৎস্য সম্পদ তদারকির জন্য মংলায় মৎস্য অধিদপ্তরের একটি সার্ভেল্যান্স চেক পোষ্ট এবং দুবলার চর ও বগিতে একটি করে মৎস্য পরিদর্শন ঘাট/ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে।
৫. উপকূলীয় মৎস্য সম্পদকে এক ও অভিন্ন স্বার্থ হিসাবে বিবেচনা করে বন অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সুন্দরবন উপকূল এলাকার মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।

মালদ্বীপ একটি ছোট দেশ কিন্তু দরিদ্র নয়। ঐ দেশের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ ও টুরিজম। আমাদের দেশে দুটিই আছে। আমরাও আমাদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারি। একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অধীনে সুন্দরবন এবং বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী।

FISHERIES RESOURCES INFORMATION OF BANGLADESH
(2003-2004)

1.	**WATER AREA OF INLAND FISHERIES**		
	(a)	**Closed Water Body**	: **513,584 ha.**
	i)	Pond & Ditches	: 305,025 ha.
	ii)	Oxbow Lake	: 5,488 ha.
	iii)	Shrimp Farm	: 203,071 ha.
	(b)	**Open Water Body (including Polder)**	: **4,920,316 ha.**
	i)	River & Estuaries	: 1,031,563 ha.
	ii)	Beel	: 114,161 ha.
	iii)	Kaptai Lake	: 68,800 ha.
	iv)	Flood Plain	: 2,832,792 ha.
	v)	Polder/Encloser	: 873,000 ha.
2.	**WATER AREA OF MARINE FISHERIES**		
	i)	Territorial Water (upto 12 nautical miles from the base line)	: 2,640 sq. n. miles
	ii)	Exclusive Economic Zone (200 nautical miles from the base line)	: 41,040 sq. n. miles
	iii)	Continental Shelf (upto 40 fathom depth) Excluding Internal & Territorial Water	: 24,800 sq. n. miles
	iv)	Coast Line	: 710 km.
3.	**FISHERMEN**		: **1,280,000**
	i)	Inland Fishermen	: 770,000
	ii)	Marine Fishermen	: 510,000
4.	**FISH FARMERS**		: **3.08 million**
	i)	Fish Farmers	: 1.93 million
	ii)	Shrimp Farmers	: 1.15 million
5.	**FISH PRODUCTION**		: **2,102,026 mt.**
	a)	**Inland Fisheries**	: **1,646,819 mt.**
	i)	Open Water (Capture)	: 732,067 mt.
	ii)	Closed Water (Culture)	: 914,752 mt.
	b)	**Marine Fisheries**	: **455,207 mt.**
	i)	Industrial	: 32,606 mt.
	ii)	Artisanal	: 422,601 mt.
6.	**EXPORT OF FISH & FISH PRODUCT (2004-05)**		
	i)	Quantity	: 63,377 ton.
	ii)	Value	: Tk. 25,717 million
	iii)	Fish Processing Plants	: 129 nos. (Licensed–64 EU Approved–57)
	iv)	Contribution to Foreign Exchange Earning	: -
8.	**FISHERIES CONTRIBUTION (2002-2003)**		
	i)	Fisheries Value in the GNP (at current market price)	: Tk. 142,588 million
	ii)	Contribution to GDP	: 4.92 %
	iii)	Contribution to Agriculture sector	: 23%

9.	**FISH INTAKE & DEMAND**		
	i)	Per Capita Annual Fish Intake	: 15.04 kg.
	ii)	Annual Total Fish Demand	: 2.43 million mt.
	iii)	Per Capita Annual Fish Needed	: 18.0 kg.
	iv)	Contribution to Animal Protein Supply	: 63 %
10.	**PRIVATE FISH HATCHERY & NURSERY**		
	i)	Fish Hatchery	: 756 nos.
	ii)	Fish Nursery	: 7,057 nos.
	iii)	Spawn Production in Hatchery	: 345,227 kg.
	iv)	Natural Fish Fry Collection	: 1,577 kg.
	v)	Fingerling Production in Nursery	: 5,030 million
11.	**PRIVATE SHRIMP/PRAWN HATCHERY**		
	i)	Bagda Hatchery	: 44 nos.
	ii)	Bagda Fry Production (Pl)	: 3,050 million
	iii)	Golda Hatchery	: 18
	iv)	Golda Fry Production	: 50 million
	v)	Natural Shrimp Fry Collection	: 450 million
12.	**PUBLIC SECTOR INFRASTRUCTURE (No.)**		
	i)	Fish/Shrimp Training Centre	: 6
	ii)	Training Academy	: 1
	iii)	Fish Hatchery/FSMF	: 112
	iv)	Spawn Production in Hatchery	: 4802 kg
	v)	Bagda (Shrimp) Hatchery	: 1
	vi)	Golda (Prawn) Hatchery	: 12
	vii)	Shrimp Demonstration Farm	: 2
	viii)	Shrimp Landing & Service Centre	: 21
	ix)	Fish Landing Centre (BFDC)	: 9
	x)	Fisheries Research Station/Sub-station	: 7
13.	**MARINE FISHING UNIT (No.), 2004-05**		
	i)	Industrial Fishing Trawlers	: 111
	ii)	Artisanal Mechanised Boats	: 21,016
	iii)	Artisanal Non-Mechanised Boats	: 22,120
	iv)	Total Artisanal Boats	: 43,136
	v)	Total Gears	: 218,581
14.	**FISH SPECIES (No.)**		
	i)	Freshwater Fish Species	: 260
	ii)	Exotic Fish Species	: 12
	iii)	Freshwater Prawn Species	: 24
	iv)	Marine Fish Species	: 475
	v)	Marine Shrimp Species	: 36
15.	**MANPOWER OF FISHERIES ORGANISATIONS**		
	i)	Department of Fisheries	: Total : 4,473 (Class I : 894)
	ii)	Bangladesh Fisheries Research Institute	: Total : 376 (Class I : 171)
	iii)	Bangladesh Fisheries Development Corporation :	Total : 688 (Class I : 78)

Compiled by Fisheries Resources Survey System, Department of Fisheries.

জাতীয় মৎস্য পক্ষ–২০০৫ এর কেন্দ্রীয় কর্মসূচি

দিন, তারিখ ও সময়	কর্মসূচি	স্থান	বাস্তবায়ন
০৪-০৮-০৫ খ্রি. বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মি.	• রেডিও–টেলিভিশনে প্রচারের জন্য সাক্ষাৎকার রেকর্ডিং	সভাকক্ষ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
০৬-০৮-০৫ খ্রি. শনিবার উদ্বোধনী দিনের আগের দিন দুপুর ১০.৩০ মি.	• সাংবাদিক সম্মেলন	সাংবাদিক সম্মেলন কেন্দ্র তথ্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব কর্তৃক জাতীয় মৎস্য পক্ষ–২০০৫ এর ওপর সাক্ষাৎকার ও সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠান বিটিভি ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার	বিটিভি, অন্যান্য টিভি চ্যানেল ও রেডিও এবং সংবাদপত্র ও বিভিন্ন মুদ্রণ গণমাধ্যম	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
১ম দিন ০৭-০৮-০৫ খ্রি. রবিবার সকাল ০৮:০০ মি.	উদ্বোধনী দিনে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ (৩টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি দৈনিক; স্পন্সর প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিক সংখ্যক)	ঢাকা থেকে প্রকাশিত নির্দিষ্ট ইংরেজি ও বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
	মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে র‍্যালি অনুষ্ঠান/ মৎস্য পক্ষের পোষ্টার, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি-সহ রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ৫ মিনিট অবস্থান	মৎস্য ভবন–শিক্ষা ভবন জিপিও, প্রেসক্লাব সড়ক – মৎস্য ভবন	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর বিএফডিসি বিএফআরআই মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
দুপুর ১২:৩০ মি.	• জাতীয় মৎস্য পক্ষ–২০০৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান – মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পোনা মাছ অবমুক্তি	বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ক্রিসেন্ট লেক, জিয়া উদ্যান	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর
	– মৎস্য ভবন আকর্ষণীয়ভাবে সজ্জিতকরণ	মৎস্য ভবন, ঢাকা	মৎস্য অধিদপ্তর
২য় দিন ০৮-০৮-০৫ খ্রি. সোমবার সকাল ১০.০০ মি.	• দারিদ্র্য বিমোচনে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনার	বিয়াম, ঢাকা	বিসিএএস (BCAS) এবং মৎস্য অধিদপ্তর
	• রাজধানীর জনবহুল স্থানে পথ নাটক অনুষ্ঠান	কাওরান বাজার, ফার্মগেইট, গুলিস্থান, ঢাকা	সিবিএফএম-২/বিএফএফইএ / বাগদা পোনা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান / পেশাজীবী সংগঠন / গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৩য় দিন ০৯-০৮-০৫ খ্রি. মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ মি.	• কেন্দ্রীয় মৎস্য মেলা উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ	শিল্পকলা একাডেমী রমনা, ঢাকা	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর
৪র্থ দিন ১০-০৮-০৫ খ্রি. বুধবার	• মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বঙ্গভবনস্থ পুকুরে পোনা মাছ অবমুক্তি	বঙ্গভবন চত্বরের পুকুর, ঢাকা	উপপরিচালক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা
৫ম দিন ১১-০৮-০৫ খ্রি. বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ মি.	• মৎস্য প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন (৭ দিন ব্যাপী)	বিএফআরআই, ময়মনসিংহ / বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসারিজ ফ্যাকাল্টির উপযোগী স্থানে	বিএফআরআই, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়/এনজিও যৌথভাবে অথবা এককভাবে

দিন, তারিখ ও সময়	কর্মসূচি	স্থান	বাস্তবায়ন
৬ষ্ঠ দিন ১২-০৮-০৫ খ্রি. শুক্রবার সকাল ০৯.০০ মি.	• হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনার	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	World Fish Centre, BSFF ও CBFM-2, মৎস্য অধিদপ্তর
৭ম দিন ১৩-০৮-০৫ খ্রি. শনিবার সকাল ১০.০০ মি.	• চলন বিলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনার	রাজশাহী	উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, পার্বতীপুর, দিনাজপুর
	• সংসদ ভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তি	সংসদ ভবন লেক, ঢাকা	উপপরিচালক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা
৮ম দিন ১৪-০৮-০৫ খ্রি. রবিবার সকাল ১০.০০ মি.	• Policy Stakeholders' Consultation: Aquaculture for Poverty Reduction	হোটেল শেরাটন, ঢাকা	Bangladesh Shrimp and Fish Foundation, ঢাকা ও মৎস্য অধিদপ্তর
৯ম দিন ১৫-০৮-০৫ খ্রি. সোমবার দুপুর ১৫.০০ মি.	• Export Potentials of Shrimp and Fish : Vision 2010 and beyond.	হোটেল পূর্বাণী, ঢাকা	BFFEA এবং মৎস্য অধিদপ্তর
১০ম দিন ১৬-০৮-০৫ খ্রি. মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ মি.	• জাটকা সংরক্ষণ ও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব শীর্ষক সেমিনার	বিএআরসি, ঢাকা	বিএফআরআই (BFRI)
১১শ দিন ১৭-০৮-০৫ খ্রি. বুধবার সকাল ১০.০০ মি.	• Sustainability of Development Projects শীর্ষক সেমিনার	কক্সবাজার	ECFC Project, মৎস্য অধিদপ্তর
১২শ দিন ১৮-০৮-০৫ খ্রি. বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ মি.	• গুলশান লেকে পোনা অবমুক্তি	গুলশান লেক, ঢাকা	বিএফডিসি (BFDC)
১৩শ দিন ১৯-০৮-০৫ খ্রি. শুক্রবার সকাল ০৯.০০ মি.	• অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনার	বিয়াম, ঢাকা	মেরিণ ফিসারিজ এসোসিয়েশন ও মৎস্য অধিদপ্তর
১৪শ দিন ২০-০৮-০৫ খ্রি. শনিবার বিকেল	• রাজধানীর জনবহুল স্থানে পথনাটক অনুষ্ঠান	ঢাকা	মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
	• মৎস্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে গোল টেবিল বৈঠক (টিভি সাক্ষাৎকার)	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় / বিটিভি স্টুডিও, ঢাকা	সিনিয়র তথ্য অফিসার মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
১৫শ দিন ২১-০৮-০৫ খ্রি. রবিবার বিকেল ০৫.৩০ মি.	• জাতীয় মৎস্য পক্ষ-২০০৫ এ অনুষ্ঠিত সকল সেমিনারের সুপারিশসমহ পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত কার্যক্রম নির্ধারণ শীর্ষক সেমিনার	শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, সিবিএফএম-২, বিএফডিসি ও বিএফআরআই এবং মৎস্য পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
সন্ধ্যা ০৭.৩০ মি.	• সমাপনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।		

Annual Total Catch and Area Productivity's by Sector Of Fisheries for July 2003 - June 2004

Sector of Fisheries	Water Area (Hectare)	Total Catch (Metric Ton)		Catch/Area (Kg/Hectare)
A. Inland Fisheries				
(i) Capture				
1. River & Estuaries	1,031,563	137,337		133
2. Sundarbans	-	15,242		-
3. Beel	114,161	74,328		651
4. Kaptai Lake	68,800	7,238		105
5. Flood Land	2,832,792	497,922		176
Capture Total	**4,047,316**	**732,067**	**34.83%**	
(ii) Culture				
1. Pond & Ditch	305,025	795,810		2,609
2. Baor	5,488	4,282		780
3. Coastal Shrimp Farm	203,071	114,660		565
Culture Total	**513,584**	**914,752**	**43.52%**	
Inland Total	**4,560,900**	**1,646,819**	**78.34%**	
B. Marine Fisheries				
(i) Industrial Fisheries (Trawl)		32,606		
(ii) Artisanal Fisheries		422,601		
Marine Total		**455,207**	**21.66%**	
COUNTRY TOTAL		**2,102,026**	**100%**	

Source: 1. Total catch of River, Beel & Baor of the inland fisheries was estimated on the basis of Frame Survey prepared in 81-83.

2. Kaptai Lake catch has been estimated by BFDC and Sundarban catch by Forest Department.

3. Total catch of the marine fisheries was estimated by the Marine sector, Department of Fisheries.

Sundarban area is included in River & Estuarine but catch shown separately.

Year-wise Fish Production of Bangladesh
1994-1995 to 2003-2004

Source	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
A. INLAND FISHERIES	**908,218**	**988,238**	**1,085,764**	**1,190,761**	**1,242,620**	**1,327,585**	**1,401,560**	**1,475,039**	**1,566,289**	**1,646,819**
(a) Inland Openwater (Capture)	**591,145**	**609,151**	**599,900**	**615,949**	**649,418**	**670,465**	**688,920**	**688,435**	**709,333**	**732,067**
(1) River & Estuaries	152,782	165,637	159,660	156,894	151,309	154,335	150,129	143,592	137,848	137,337
(2) Sundarbans	6,951	7,265	9,225	7,031	11,134	11,648	12,035	12,345	13,884	15,242
(3) Beel (Depression)	58,298	60,768	62,798	67,812	69,850	72,825	74,527	76,101	75,460	74,328
(4) Kaptai Lake	5,556	6,148	5,764	5,932	6,689	6,852	7,051	7,247	7,025	7,238
(5) Flood Land	367,558	369,333	362,453	378,280	410,436	424,805	445,178	449,150	475,116	497,922
(b) Inland Closewater (Culture)	**317,073**	**379,087**	**485,864**	**574,812**	**593,202**	**657,120**	**712,640**	**786,604**	**856,956**	**914,752**
(1) Pond & Ditch	267,282	307,974	403,830	483,416	499,590	561,050	615,825	685,107	752,054	795,810
(2) Baor (Ox-bow Lake)	2,460	2,764	3,014	3,378	3,536	3,622	3,801	3,892	4,098	4,282
(3) Coastal Shrimp Farm	47,331	68,349	79,020	88,018	90,076	92,448	93,014	97,605	100,804	114,660
B. MARINE FISHERIES	**264,650**	**269,702**	**274,704**	**272,818**	**309,797**	**333,799**	**379,497**	**415,420**	**431,908**	**455,207**
(a) Industrial	11,715	11,959	13,564	15,273	15,818	16,304	23,901	25,165	27,954	32,606
(b) Artisanal	252,935	257,743	261,140	257,545	293,979	317,495	355,596	390,255	403,954	422,601
COUNTRY TOTAL	**1,172,868**	**1,257,940**	**1,360,468**	**1,463,579**	**1,552,417**	**1,661,384**	**1,781,057**	**1,890,459**	**1,998,197**	**2,102,026**
ANNUAL GROWTH RATE OF PRODUCTION	**7.54**	**7.25**	**8.15**	**7.58**	**6.07**	**7.02**	**7.20**	**6.14**	**5.70**	**5.20**

Export of Fish and Fish-Product from Bangladesh

Quantity in Tons.
Value in Crore Taka.

Year	Frozen Shrimp		Frozen Frog Leg		Frozen Fish		Dry fish		Salted & Dehy-drated fish		Turtles/Tortoises/ Crab		Shark fin & Fish Maws		Total		% of Total Export Earning
	Quan	Value	Quan	Value	Quan	Value	Quan	Value	Quan	Value	Quan	Value	Quan	Value	Quan	Value	
1986-87	16275	341.75	2168	30.56	4046	35.41	402	4.9	295	3.84	461	4.1	114	3.49	23,761	424.05	12.98
1987-88	15023	361.17	2708	42.42	4191	28.35	475	6.69	372	4.81	524	6.06	130	4.62	23423	454.12	11.93
1988-89	15386	382.05	2685	43.82	2427	22.59	567	13.89	293	4.12	293	2.65	68	2.77	21719	471.89	11.51
1989-90	17505	414.31	730	10.29	3484	25.58	1278	23.40	161	1.44	146	0.95	35	2.80	23339	478.77	9.62
1990-91	17985	451.22	318	7.36	5702	41.40	427	5.75	1194	13.95	405	3.22	78	3.72	26109	526.62	8.64
1991-92	16730	455.73	771	11.09	2604	30.10	892	14.11	80	1.39	938	6.52	65	5.41	22080	524.35	6.91
1992-93	19224	604.03	-		2704	38.31	1042	12.26	599	9.84	2800	21.60	238.39	14.25	26607	700.29	7.57
1993-94	22054	787.73	-		3125	51.18	2473	41.83	50	1.06	4088	36.37	45	2.79	31835	920.96	9.12
1994-95	26277	1045.67	-	-	9267	180.26	521	8.39	649	15.35	4760	40.67	212	16.60	41686	1306.94	9.38
1995-96	25225	1106.39	-	-	8827	176.62	182	3.05	436	11.47	4203	39.20	56	4.21	38929	1340.94	9.38
1996-97	25742	1188.91	-	-	8754	176.74	427	7.92	561	13.81	5952	61.48	113	8.55	41549	1457.41	7.75
1997-98	18630	1181.48	-	-	8836	151.66	233	3.11	1106	26.43	1198	14.34	155	10.79	30158	1387.81	5.83
1998-99	20127	1162.21	-	-	6395	153.96	137	2.23	1232	37.18	486	6.39	154	17.40	28531	1379.37	5.41
1999-00	28514	1612.15	-	-	9484	137.19	215	3.65	809	25.96	107	1.44	262	31.17	39391	1811.56	6.28
2000-01	29713	1885.15	-	-	7965	94.89	137	2.02	838	27.73	154	2.33	181	20.63	38988	2032.75	5.77
2001-02	30209	1447.76	-	-	9864	137.39	517	8.32	293	9.53	336	7.07	263	27.07	41482	1637.14	4.76
2002-03	36864	1719.88	-	-	8846	158.64	333	7.02	526	19.12	630	14.58	172	22.35	47371	1941.59	5.10
2003-04	42943	2152.77	-	-	10229	202.24	472	4.16	377	1.38	116	1.39	4	1.53	54141	2363.47	5.71
2004-05	46533	2281.59	-	-	15763	256.2	272	3.71	770	28.97	38	0.86	1	0.39	63377	2571.72	-

Source : Export Promotion Bureau. *Including chilled fish

Chilled Hilsha exported to India is 3584 m.t. and export earning value is about 51.95 crore Tk. Source for the year 2004-05 regular export statement from certificate issued by Fish Inspection & Quality Control, DoF.

Shrimp Catch

Year	Shrimp Catch (M.T.)				% of Culture Shrimp
	Inland Fishereis		Marine Fisheries	Total	
	Capture	Culture			
1986-1987	42,882	14,773	15,154	72,809	20.29
1987-1988	36,386	17,889	15,080	69,355	25.79
1988-1989	42,824	18,235	17,104	78,163	23.33
1989-1990	36,284	18,624	15,868	70,776	26.31
1990-1991	43,262	19,489	17,633	80,384	24.24
1991-1992	61,042	20,335	20,042	101,419	20.05
1992-1993	78,226	23,530	23,975	125,731	18.71
1993-1994	50,721	28,302	21,519	100,542	28.15
1994-1995	58,973	34,030	20,363	113,366	30.02
1995-1996	44,079	46,223	26,353	116,655	39.62
1996-1997	41,868	52,272	24,818	118,958	43.94
1997-1998	46,635	62,167	24,790	133,592	46.53
1998-1999	49,296	63,164	31,742	144,202	43.80
1999-2000	43,167	64,647	31,395	139,209	46.44
2000-2001	44,343	64,970	31,037	140,350	46.29
2001-2002	54,965	65,579	31,976	152,520	43.00
2002-2003	60,876	66,703	31,931	159,510	41.82
2003-2004	63,103	75,167	36,488	174,758	43.01

Culture Shrimp

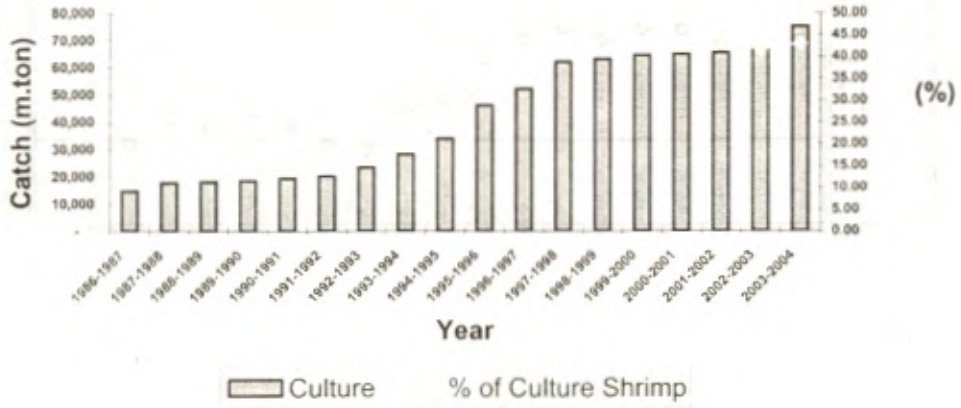

মৎস্য পক্ষ-২০০৫ এর অনুমোদিত কর্মসূচি

জেলা পর্যায়ে

তারিখ: ৭/৮/২০০৫ রোজ: রবিবার (১ম দিন)	১	র‍্যালি অনুষ্ঠান
	২	মৎস্য চাষি / মডেল মাছ চাষি / মৎস্যজীবী /মৎস্য ব্যবসায়ী / হ্যাচারি ও নার্সারির মালিক/ রক্তানীকারক / স্কুল কলেজের শিক্ষক / শিশু / যুবক /যুব মহিলা / সুধী সমাবেশ
	৩	মাননীয় মন্ত্রী /প্রতিমন্ত্রী / উপমন্ত্রী / সংসদ সদস্য কর্তৃক মৎস্য পক্ষ ২০০৫ উদ্বোধন
	৪	সরকারী দীঘি-পুকুর / মুক্ত জলাশয়ে / প্লাবনভূমিতে পোনা মজুদ
	৫	জেলার শ্রেষ্ঠ ৩ জন মৎস্য চাষিকে পুরস্কার প্রদান
	৬	বিভাগে মৎস্য প্রযুক্তি মেলা ৫ দিন ব্যাপী
তারিখ:০৮/০৮/২০০৫-১১/৮/২০০৫ (সোমবার-বৃহস্পতিবার) ২য় থেকে ৫ম দিন (৪দিন)	১	মৎস্য প্রযুক্তি মেলা (মাঠ দিবস / কৃতি মৎস্য চাষিদের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড প্রদর্শন) কর্মসূচির আওতায় ফলাফল প্রদর্শনকারী চাষি / সমিতি নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত চাষির জলাশয় পাড়ে ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠান । তার অভিজ্ঞতা শ্রবণ, জাল টেনে মাছ প্রদর্শনের ব্যবস্থা। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ৩ দিনের কর্মসূচি প্রণয়ন পূর্বক বাস্তবায়ন করবেন
	২	- জেলা পর্যায়ের স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য স্থানে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বিশেষ করে কারেন্টজালের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে আলোচনা সভা - পুকুর উন্নয়ন আইনের সুফল সম্পর্কে আলোচনা
তারিখ: ১২/৮/২০০৫, রোজ: শুক্রবার		সাপ্তাহিক ছুটি
তারিখ: ১৩/৮/২০০৫ রোজ: শনিবার, ৭ম দিন		- মৎস্য ঋণ প্রদান সম্পর্কে আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, ব্যাংক, এনজিও এবং মৎস্য বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিভাগ এবং নেতৃস্থানীয় চাষীও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করতে হবে। - জেলার মৎস্য অধিদপ্তরের সফল প্রকল্পের বিষয়ে সুফলভোগী কর্তৃক সুধী সমাবেশে তথ্য উপস্থাপন/ - মাছের প্রজনন মৌসুমে সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ে আলোচনা সভা
তারিখ: ১৪/৮/২০০৫ রোজ: রবিবার ৮ম দিন		- ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব এবং ক্ষতিগ্রস্থদের বিকল্প কর্মসংস্থান শীর্ষক আলোচনা সভা - মৎস্যজীবী সংগঠন কর্তৃক মৎস্য সংরক্ষণ আইন ,পুকুর উন্নয়ন আইন সম্পর্কে আলোচনা ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা।
তারিখ: ১৫/৮/২০০৫ রোজ: সোমবার ৯ম দিন		জেলা পর্যায়ে সদর উপজেলার মৎস্য চাষি/বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য মাছ চাষের প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত ১দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ। জেলা পর্যায়ের সমাজ সেবা/ মহিলা অধিদপ্তর / এনজিও / যুব অধিদপ্তর কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ঐরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন
তারিখ:১৬/৮/২০০৫ রোজ: মঙ্গলবার ১০ম দিন		- সামুদ্রিক মাছের পুষ্টিগুন সম্পর্কে আলোচনা সভা। - জেলা পর্যায়ে মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা/ জেলায় মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা
তারিখ: ১৭/৮/২০০৫ রোজ: বুধবার ১১শ দিন		স্কুল, কলেজ / মাদ্রাসার / ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে মাছ চাষের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাছ চাষ বিষয়ক কুইজ/রচনা / চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান। ১ম, ২য় ও ৩য়কে মাছ চাষ ম্যানুয়েল ও সহায়ক পুস্তিকা প্রদান
তারিখ: ১৮/৮/২০০৫ রোজ: বৃহস্পতিবার ১২শ দিন		উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ, পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ, মিনিপুকুরে মাছ চাষ, প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ/কাকড়া চাষ/ মুক্তাচাষ/ ছোট মাছের চাষ, বাড়ীর ছাদে টোবাচ্চায় মাছ চাষ ইত্যাদি বিষয়াদিকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
১৯/০৮/২০০৫, রোজ: শুক্রবার		সাপ্তাহিক ছুটি
তারিখ: ২০-৮-০৫ রোজ:শনিবার ১৪শ দিন		মুক্ত জলাশয়ের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে মৎস্য অভয়াশ্রমের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় জনপ্রতিনিধি /প্রশাসন / মৎস্যজীবী সংগঠন, এনজিও এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
তারিখ: ২১/৮/০৫, রোজ: রবিবার ১৫শ দিন		মৎস্য বিষয়ক সাংস্কৃতিক ও সমাপনী অনুষ্ঠান
১ম হতে ১৫শ দিন পর্যন্ত	ক	সরকারী খামার হতে সুলভ মূল্যে পোনা বিতরণ
	খ	জেলা মৎস্য অফিস হতে মৎস্য চাষ বিষয়ক পুস্তক পুস্তিকা বিতরণ, পরামর্শ প্রদান, প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি/ প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি।

** যে সব স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত সে সব স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করে জেলার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।*

মৎস্য পক্ষ ২০০৫ এর অনুমোদিত কর্মসূচি

উপজেলা পর্যায়ে

তারিখ: ৭/৮/২০০৫ রোজ:রবিবার, ১ম দিন	১	র‍্যালি অনুষ্ঠান
	২	মৎস্য পক্ষ উদ্বোধন (উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে)। মৎস্যচাষি, হ্যাচারি ও নার্সারি মালিক, মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী, যুবক ও যুব মহিলা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সভা-সমাবেশ। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী/সংসদ সদস্য কর্তৃক সরকারী কিংবা আধা সরকারী স্কুল/কলেজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি বা কোন সংগঠনের দিঘি-পুকুর কিংবা জলমহালে পোনা মজুদকরণ। উপজেলার শ্রেষ্ঠ ৩ জন মৎস্য চাষিকে পুরস্কার প্রদান
০৮/০৮/২০০৫-১১/০৮/২০০৫ রোজ:সোমবার-বৃহস্পতিবার ২য়-৫ম দিন (৪দিন)	১	উপজেলার জনবহুল স্থানে / জনাকীর্ণ দিবসে (হাট বার) মাছচাষ বিষয়ক গানের আয়োজন
	২	মৎস্য প্রযুক্তি মেলা (মাঠ দিবস/কৃতি মৎস্য চাষিদের উল্লেখ্যযোগ্য কর্মকাণ্ড প্রদর্শন) কর্মসূচির আওতায় ফলাফল প্রদর্শনকারী চাষি/সমিতি নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত চাষির জলাশয় পাড়ে ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠান। তার অভিজ্ঞতা শ্রবণ, জাল টেনে মাছ প্রদর্শনের ব্যবস্থা। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ৩ দিনের কর্মসূচি প্রণয়ন পূর্বক বাস্তবায়ন করবেন
	৩	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে মাছ চাষ এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও পুকুর উন্নয়ন আইন সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠান। গ্রামে গঞ্জে মাছ চাষ এবং মৎস্য আইন সম্পর্কে প্রচারণা চালানো
তারিখ:১২/০৮২০০৫ রোজ:শুক্রবার, ৬ষ্ঠ দিন		সাপ্তাহিক ছুটি
১৩/৮/২০০৫ রোজ: শনিবার, ৭ম দিন		- মাছের প্রজনন মৌসুমে সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ে আলোচনা সভা - উপজেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের সফল প্রকল্পের বিষয়ে সুফলভোগী কর্তৃক সুধী সমাবেশে তথ্য উপস্থাপন
১৪/০৮২০০৫ - ১৫/০৮/২০০৫ রোজ:রবিবার- সোমবার ৮ম-৯ম দিন (২দিন)	১	মৎস্য ঋণ প্রদান সম্পর্কে আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, ব্যাংক, এনজিও এবং মৎস্য বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিভাগ এবং নেতৃস্থানীয় চাষীও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করতে হবে
	২	বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের মাছ চাষে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান
	৩	আনসার, ভিডিপি ও পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বি.আর. ডি. বি) এর সদস্যদেরকে মাছ চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান
তারিখ:১৬/০৮/২০০৫ রোজ:মঙ্গলবার,১০ম দিন		- ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব এবং ক্ষতিগ্রস্তদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ে আলোচনা সভা - সামুদ্রিক মাছের পুষ্টিগুন সম্পর্কে আলোচনা সভা
তারিখ:১৭/০৮/২০০৫ রোজ: বুধবার, ১১শ দিন		উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ, পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ, মিনিপুকুরে মাছ চাষ, প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ/কাঁকড়া চাষ/ মুক্তা চাষ, ছোট মাছের চাষ, বাড়ীর ছাদে চৌবাচ্চায় মাছ চাষ ইত্যাদি বিষয়াদিকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

তারিখ:১৮/০৮/২০০৫ রোজ:বৃহস্পতিবার,১২শ দিন		- মৎস্য জীবি সংগঠন কর্তৃক মৎস্য সংরক্ষণ আইন বিশেষ করে কারেন্টজালের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে আলোচনা - সভা, পুকুর উন্নয়ন আইন সম্পর্কে আলোচনা ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা - মুক্ত জলাশয়ের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে মৎস্য অভয়াশ্রমের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা সভা
তারিখ:১৯/০৮/২০০৫ রোজ:শুক্রবার, ১৩শ দিন		সাপ্তাহিক ছুটি
২০/৮/২০০৫ রোজ:শনিবার, ১৪শ দিন		ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাছ চাষের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য মাছ চাষ বিষয়ক কুইজ/রচনা/চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান। ১ম ,২য় ও ৩য়কে মাছ চাষ ম্যানুয়েল ও সহায়ক পুস্তিকা প্রদান
তারিখ:২১০৮/২০০৫ রোজ:রবিবার, ১৫শ দিন		মাছ ও মাছ চাষ ভিত্তিক সাংস্কৃতিক (মাছ সংক্রান্ত গান, ছড়া, কৌতুক, নৃত্যপরিবেশন) ও সমাপনী অনুষ্ঠান
১ম-১৫শ দিন পর্যন্ত	ক	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ সামগ্রী, রাসায়নিক দ্রব্য,ঔষধপত্র ইত্যাদির উপর প্রদর্শনী এবং পুস্তক-পুস্তিকা বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান।
	খ	যে উপজেলায় খামার আছে, সেখান থেকে সুলভ মূল্যে পোনা মাছ বিতরণ

জাতীয় মৎস্য পক্ষ-২০০৫ পুরস্কার

ক্ষেত্র		প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নাম	পুরস্কার
ক)	মাছের রেণু উৎপাদন	মোঃ আহসাণ হাবিব (সাজু) গ্রামঃ ইলাসপুর, উপজেলাঃ ফেনী সদর জেলাঃ ফেনী, বিভাগঃ চট্টগ্রাম	স্বর্ণ পদক
		মোঃ সামছুদ্দিন কালু গ্রামঃ হরিপুর, উপজেলাঃ লাঙ্গলকোর্ট জেলাঃ কুমিল্লা, বিভাগঃ চট্টগ্রাম	রৌপ্য পদক
		মোঃ সাইদুর রহমান গ্রামঃ হাটনওগাঁ উপজেলাঃ নওগাঁ জেলাঃ নওগাঁ, বিভাগঃ রাজশাহী	ব্রোঞ্জ পদক
খ)	মাছের পোনা উৎপাদন	আল আমিন মৎস্য খামার প্রোঃ জনাব মোঃ হাজী সালাউদ্দীন গ্রামঃ চাচড়া, পোঃ চাচড়া, উপজেলাঃ যশোর সদর জেলাঃ যশোর, বিভাগঃ খুলনা	স্বর্ণ পদক
		জনাব এম. এস এজাহার মিয়া হজরত ওয়াশিল ফকির মৎস্য উন্নয়ন হ্যাচারি (প্রাঃ) লিঃ গ্রামঃ পারিগ্রাম, পোঃ চক্রশালা, উপজেলাঃ পটিয়া জেলাঃ চট্টগ্রাম, বিভাগঃ চট্টগ্রাম	রৌপ্য পদক
		জনাব মোঃ তৈয়ব আলী খান গ্রামঃ পটুয়াপাড়া, উপজেলাঃ নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর, বিভাগঃ রাজশাহী	ব্রোঞ্জ পদক
গ)	মাছ উৎপাদন	মেসার্স আকিব মৎস্য প্রকল্প গ্রামঃ গোবিন্দপুর, উপজেলাঃ লাকসাম জেলাঃ কুমিল্লা, বিভাগঃ চট্টগ্রাম	স্বর্ণ পদক
		আলহাজ সৈয়দ আহমেদ (মুকিত) শাহ কাদেরিয়া লতিফিয়া (প্রাঃ) লিঃ গ্রামঃ বানিকা, উপজেলাঃ মৌলভীবাজার জেলাঃ মৌলভীবাজার, বিভাগঃ সিলেট	রৌপ্য পদক
		কোষ্টাল এ্যাগ্রো ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট লিঃ জনাব এ এস এম আবদুল্লাহ গ্রামঃ চরকলার্ক, উপজেলাঃ সুবর্নচর, জেলাঃ নোয়াখালী, বিভাগঃ চট্টগ্রাম	ব্রোঞ্জ পদক
ঘ)	চিংড়ির পি. এল উৎপাদন	সোনারগাঁ চিংড়ি প্রকল্প কলাতলী হ্যাচারি জোন, কক্সবাজার	স্বর্ণ পদক
		বলাকা হ্যাচারি লিঃ নিদানিয় উখিয়া, কক্সবাজার	রৌপ্য পদক
ঙ)	চিংড়ি উৎপাদন (গলদা)	কার্তিক বিশ্বাস গ্রামঃ কলকলিয়া, উপজেলাঃ ফকিরহাট জেলাঃ বাগেরহাট, বিভাগঃ খুলনা	স্বর্ণ পদক
		মোঃ রশিদুল ইসলাম গ্রামঃ একতারপুর, উপজেলাঃ অভয়নগর, জেলাঃ যশোর বিভাগঃ খুলনা	রৌপ্য পদক

	ক্ষেত্র	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নাম	পুরস্কার
চ)	মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিকরণ (হিমায়িত চিংড়ি/মৎস্য/ শুটকি)	মিনহার সী ফুডস লিঃ চট্টগ্রাম	স্বর্ণ পদক
		কুলিয়ার চর সী ফুডস লিঃ, কক্সবাজার	রৌপ্য পদক
		মডার্ন সী ফুডস লিঃ , খুলনা	ব্রোঞ্জ পদক
ছ)	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে উদ্যোক্তা সৃষ্টি	ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন গ্রামঃ গয়েশপুর, উপজেলাঃ দাউদকান্দি জেলাঃ কুমিল্লা, বিভাগঃ চট্টগ্রাম	স্বর্ণ পদক
জ)	মৎস্য বিষয়ক প্রকাশনা	মোহাম্মদ মুজাফ্ফর হুসেইন মহাব্যবস্থাপক, গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশন এবং এনপিডি, কমিউনিটি লাইভষ্টক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	স্বর্ণ পদক
		ডঃ মোঃ ইনামুল হক গ্রামঃ আমলাপাড়া, উপজেলাঃ কতোয়ালী, জেলাঃ ময়মনসিংহ, বিভাগঃ ঢাকা ।	রোপ্য পদক
		ডঃ মো আবুল মনসুর, প্রফেসর ফিশারীজ টেকনোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,ময়মনসিংহ	ব্রোঞ্জ পদক

দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার ।

নাম ও পদবী	অবদান
প্রফেসর ড. মোঃ আলতাফ হোসেন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	দেশে মৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাতে অবদান রেখে আসছেন। মৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ।
জনাব শাইখ সিরাজ পরিচালক, চ্যানেল আই, ঢাকা	ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জনমত গঠন এবং উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন ।
জনাব মোঃ সামসুজ্জোহা খান, সংসদ সদস্য নওগাঁ-২	দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ।

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর

নাম ও পদবী	ফোন নং
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় **বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।**	**ফ্যাক্স নং** ৮৬১১১১৭,৮৬১৮১৮ ২
জনাব আবদুল্লাহ আল নোমান **এম.পি** **মাননীয় মন্ত্রী**	৭১৬২৪৩০ (অ) ৭১৬১৫৫৫(অ) ৮৩২২৮৬৬ (বা) ফ্যাক্স ঃ ৭১৬৮১৮২
জনাব কামাল উদ্দিন ভূইয়া মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব	৭১৬৩৯৩০ (অ) ৮৬৫০২৬৪ (বা)
জনাব সৈয়দ আলমগীর কবির মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৭১৬৪৭০২ (অ) ৭২১৯৯১১ (বা)
জনাব সুবোধ চন্দ্র ঢালী মাননীয় মন্ত্রীর সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা	৭১৬২৫১৬ (অ) ৮৩২২৬০১ (বা)
জনাব আজিজুল হক মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭১৬২৪৩০ (অ) ৭১৬১৫৫৫ (অ)
জনাব মোঃ আবদুল করিম সচিব	৭১৬৪৭০০ (অ) ৮৮৫৬৬৯২ (বা) ফ্যাক্স ৭১৬১১১৭ e-mail: Secy mofl@bttb.net.bd
জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব	৭১৬১২৫৮ (অ) ৮০৫৭৯৬৫ (বা)
জনাব ইকবাল মাহমুদ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/পশুসম্পদ)	৭১৬৬২৬৩ (অ)
বেগম রোকেয়া সুলতানা যুগ্ম-সচিব (মৎস্য)	৭১৬১৯৭৭ (অ) ৮১২২৪৫৫ (বা)
জনাব ডঃ মোঃ গোলাম সারওয়ার যুগ্ম-প্রধান	৭১৬৭৯৬৯ (অ)
জনাব ফখরুল ইসলাম উপ-সচিব (মৎস্য-১)	৭১৬৯৫৬৩ (অ) ৮৩৫৪৭৭৭ (বা)
জনাব মবতুজা আহমদ উপ-সচিব (মৎস্য-২)	৭১৬২৭৮৩ (অ) ৮৮৫২৩৬৫ (বা)

নাম ও পদবী	ফোন নং
জনাব খন্দকার আতিয়ার রহমান উপ-সচিব (পশুসম্পদ)	৭১৬৯৫৬২ (অ) ৮৩১৬৯৮৬ (বা)
জনাব মোঃ ছবির আহম্মদ উপ-সচিব (প্রশাসন)	৭১৬৯৫৬৫ (অ) ৮৩৫৯৭৮৪ (বা)
বেগম রহিমা নাহার উপ-প্রধান	৭১৬৯৫৬৪ (অ) ৮১২৬৬৮০ (বা)
বেগম তাহমিদা আহমেদ সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)	৯৫৫৩৮৪০ (অ) ৯৬৭৭০৩০ (বা)
জনাব জাহাঙ্গীর আলম খান সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২)	৭১৬৪৬৯১(অ) ৮৬২৯৫৫৪(বা)
জনাব মোঃ মোহসীন সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)	৭১৬১৪০৭(অ) ৮৩৬২৪৪৮(বা)
জনাব মনির হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪)	৯৫৫১০০৭(অ) ৮৮৫৫৫৯(বসা অনু)
জনাব মোঃ আনিছুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-১)	৭১৭২২৫৪৫(অ) ৯৬৬৯৪৭৯(বা)
জনাব মোঃ আইয়ুব সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-২)	৭১৬৭৩০৬(অ) ৯৬৬৬৮৯২(বা)
মিসেস হোসনে আরা সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৩)	৭১৭০০৫২(অ) ৮১৫১৭৮০(বা)
জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪)	৭১৭২০৩৮(অ)
বেগম নাজনীন কাউছার চৌধুরী সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৫)	৭১৭২১৪১(অ) ৯৩৩৩০১৪(বা)
বেগম আয়েশা বেগম সিনিয়র সহকারী প্রধান (মৎস্য-২)	৯৫৫০৩৭১(অ)
মৎস্য অধিদপ্তর **মৎস্য ভবন, ঢাকা**	**website:** **www.fisheries.gov.bd**
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ মহাপরিচালক	ফ্যাক্স ঃ ৯৫৬৮৩৯৩ ৯৫৬২৮৬১ (অ) ৯৫৬১৩৮৩ (অ) ৮১৫৮৮৮৬ (বা) e-mail:dg@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পরিচালক, (অভ্যন্তরীণ মৎস্য)	৯৫৬১৩৫৫(অ) ৮১১৭০৫৭(বা) e-mail: mamal@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নং
জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯৫৬৯৯৪৩ (অ) ৯৩৬২১৩৯ (বা) e-mail: mokammel@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯৫৬০৫২৬ (অ) ৮০৫৮৯৬৭ (বা) e-mail: rafiq@ fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	৯৫৬৭২১৭(অ) /ফ্যাক্স ৯৩৫৪১০৮ (বা)
জনাব মুহম্মদ শহীদুল ইসলাম উপ-পরিচালক (মৎস্য চাষ)	৯৫৬৯৩৫৫(অ) ৯৫৬১৫৯২(অ) /ফ্যাক্স ৯১২১৭৩২(বা) shahid@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম আকন্দ প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প	৯৫৬৯৯৩৪ (অ) ৮৬১০৯১৪ (বা) ফ্যাক্স ঃ ৯৫৬৭২১৬ e-mail: sariful@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ শওকত আলী উপ-পরিচালক, (পরিকল্পনা ও অর্থ)	৯৫৫৩০৮৮ (অ) ৮৯৫৩১৬৫ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প	৯৫৬১৬৮৫ (অ) ৮২৫১৬৪৫ (বা)
বেগম আনওয়ারী প্রকল্প পরিচালক ক্রড ব্যাংক প্রকল্প	৭১৬০৪৯৪ (অ) ৮৩১৩৩৯৩ (বা)
জনাব এম. শাহাজত আলী উপ-প্রকল্প পরিচালক, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প	৯৫৬৭২১৬ (অ)
জনাব আমির হোসেন উপ-প্রকল্প পরিচালক, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প	৯৫৬০৬৫৩ (অ) ৮৮৫২৭৬৫ (বা)

নাম ও পদবী	ফোন নং
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান প্রকল্প পরিচালক, সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-২	৯৫৭১৬৯৬ (অ) ৯১৩৮৯৯০ (বা)
ডঃ আবুল কাসেম মোঃ ইয়াহিয়া নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬৫০২২ (অ) ৯১৩৮১৪৪ (বা)
জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন সহকারী পরিচালক	৯৫৫৪৯৯২ (অ) ৮১৫২৮৫৩ (বা)
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬১৫৯২ (অ)
বেগম আক্তার জাহান চৌধুরী সহকারী প্রধান	৯৫৬৫০২১ (অ) ৯৬৬২৭৯০ (বা)
জনাব মোঃ ইস্কান্দর আলী সহকারী পরিচালক	৯৫৫৫৩৪৯ (অ) ৯৩৩৫৬৭৫ (বা)
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম সহকারী প্রধান	৯৫৬৫০২৩ (অ) ৯১৩৮১০৫ (বা)
জনাব মোঃ ফজলুর রহমান সহকারী পরিচালক	৯৫৫২১৭৯ (অ)
জনাব রমেশ চন্দ্র মন্ডল সহকারী পরিচালক	৯৫৬১৬৮৫ (অ) ৮৮৬০০৯৬ (বা)
জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম সহকারী পরিচালক	৯৫৬০৫২৫ (অ)
জনাব মোঃ আলীমুজ্জামান চৌধুরী নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)	৯৫৬৭২১৮ (অ) ৯১২৭৩৪৭ (বা)
ডঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	৯৫৬৭২১৯ (অ) ৯১১৬৫৯৫ (বা)
জনাব মোঃ আবুল খায়ের সহকারী পরিচালক	৯৫৬০৪৭২ (অ)
জনাব মোঃ আলিউর রেজা সহকারী পরিচালক	৯৫৬১৬৮৫ (অ) ৯৩৩১৪৯৯ (বা)
জনাব খন্দকার মাহবুবুল হক সহকারী পরিচালক	৯৫৬৯৯৫৩ (অ)
জনাব গোলাম মোঃ সামসুল কবির সহকারী পরিচালক,	৯৫৭১৬৯৮ (অ) ৮৯৫৪২৮৪ (বা)
জনাব আ.জ.ম বদরুল হাসান উপ-সহকারী পরিচালক	৯৫৬৯৩২০ (অ) ৯৮৯৪৫৮৭ (বা)
বেগম শাহিন আক্তার	৯৫৭১৬৯৮ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নং
স্বাদু পানি উপকেন্দ্র, শান্তাহার, বগুড়া	
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা স্বাদু পানি উপকেন্দ্র, যশোর	০৪২১/৭৪০৪৩(অ)
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি	০৩৫১/৬২১৫৯(অ)
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা	**ফ্যাক্স:৮৮-০২-৯৫৬৩৯৯০**
জনাব মোঃ শরীফ তৈয়বুর রহমান চেয়ারম্যান	৭১৬২০০১(অ) ৯৬৬৩৬৪২ (বা)
জনাব মোঃ তাইয়েবুর রহমান পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৩৯৭৫(অ) ৯৩৫৪৮৬৯(বা)
জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন সচিব	৯৫৫২৬৮৯ (অ) ৮৩৬২১৮৯ (বা)
জনাব এম সফিকুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (বাস্তবায়ন)	৯৫৬১২৭২ (অ) ৮১২৬১৬৯ (বা)
জনাব মোঃ ইসহাক ব্যবস্থাপক ক্রয় বিভাগ	৯৫৫২০৭৬/২(অ) ৯০০৮১৪৯ (বা)
জনাব নূরু-উন নবী সরকার মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর	০৩১/৬১৩০০৬ (অ) ০৩১/৬৫৬১৮৬ (বা)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেইট, ঢাকা	
ডঃ এম নুরুল ইসলাম চেয়ারম্যান	৮১১৪০৩২
ডঃ খবীর আহমেদ মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৮১১০৬১৮ (অ) ৭৭১২৪৩৬ (বা)
পশুসম্পদ অধিদপ্তর	**ফ্যাক্স** ৯১১০৩২৬
ডঃ সালেহ উদ্দিন মাহমুদ মহাপরিচালক	৮১১৫৫৩২ (অ) ৮১৫৮৮৯০ (বা)
জনাব সুনীল চন্দ্র ঘোষ পরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১২৩৮৮১ (অ)
জনাব মফিজুর রহমান পরিচালক (উৎপাদন)	৮৮২১৯৯১ (অ) ৯১১৪০৯৯(বা)
ডঃ কাজী মোঃ ইমদাদুল হক মহাপরিচালক, পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৭৭০৮৩২০ (অ) ৯১৩০৫৭৬ (বা)
পরিকল্পনা কমিশন শেরেবাংলানগর, ঢাকা	

নাম ও পদবী	ফোন নং
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা স্বাদু পানি উপকেন্দ্র, যশোর	০৪২১/৭৪০৪৩(অ)
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি	০৩৫১/৬২১৫৯(অ)
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা	**ফ্যাক্স:৮৮-০২-৯৫৬৩৯৯০**
জনাব মোঃ শরীফ তৈয়বুর রহমান চেয়ারম্যান	৭১৬২০০১(অ) ৯৬৬৩৬৪২ (বা)
জনাব মোঃ তাইয়েবুর রহমান পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৩৯৭৫(অ) ৯৩৫৪৮৬৯(বা)
জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন সচিব	৯৫৫২৬৮৯ (অ) ৮৩৬২১৮৯ (বা)
জনাব এম সফিকুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (বাস্তবায়ন)	৯৫৬১২৭২ (অ) ৮১২৬১৬৯ (বা)
জনাব মোঃ ইসহাক ব্যবস্থাপক ক্রয় বিভাগ	৯৫৫২০৭৬/২(অ) ৯০০৮১৪৯ (বা)
জনাব নূরু-উন নবী সরকার মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর	০৩১/৬১৩০০৬ (অ) ০৩১/৬৫৬১৮৬ (বা)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেইট, ঢাকা	
ডঃ এম নুরুল ইসলাম চেয়ারম্যান	৮১১৪০৩২
ডঃ খবীর আহমেদ মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৮১১০৬১৮ (অ) ৭৭১২৪৩৬ (বা)
পশুসম্পদ অধিদপ্তর	**ফ্যাক্স** ৯১১০৩২৬
ডঃ সালেহ উদ্দিন মাহমুদ মহাপরিচালক	৮১১৫৫৩২ (অ) ৮১৫৮৮৯০ (বা)
জনাব সুনীল চন্দ্র ঘোষ পরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১২৩৮৮১ (অ)
জনাব মফিজুর রহমান পরিচালক (উৎপাদন)	৮৮২১৯৯১ (অ) ৯১১৪০৯৯(বা)
ডঃ কাজী মোঃ ইমদাদুল হক মহাপরিচালক, পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৭৭০৮৩২০ (অ) ৯১৩০৫৭৬ (বা)
পরিকল্পনা কমিশন শেরেবাংলানগর, ঢাকা	

নাম ও পদবী	ফোন নং
স্বাদু পানি উপকেন্দ্র, শাস্তাহার, বগুড়া	
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা স্বাদু পানি উপকেন্দ্র, যশোর	০৪২১/৭৪০৪৩(অ)
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি	০৩৫১/৬২১৫৯(অ)
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা	**ফ্যাক্স:৮৮-০২-৯৫৬৩৯৯০**
জনাব মোঃ শরীফ তৈয়বুর রহমান চেয়ারম্যান	৭১৬২০০১(অ) ৯৬৬৩৬৪২ (বা)
জনাব মোঃ তাইয়েবুর রহমান পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৩৯৭৫(অ) ৯৩৫৪৮৬৯(বা)
জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন সচিব	৯৫৫২৬৮৯ (অ) ৮৩৬২১৮৯ (বা)
জনাব এম সফিকুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (বাস্তবায়ন)	৯৫৬১২৭২ (অ) ৮১২৬১৬৯ (বা)
জনাব মোঃ ইসহাক ব্যবস্থাপক ক্রয় বিভাগ	৯৫৫২০৭৬/২(অ) ৯০০৮১৪৯ (বা)
জনাব নূরু-উন নবী সরকার মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর	০৩১/৬১৩০০৬ (অ) ০৩১/৬৫৬১৮৬ (বা)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেইট, ঢাকা	
ডঃ এম নুরুল ইসলাম চেয়ারম্যান	৮১১৪০৩২
ডঃ খবীর আহমেদ মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৮১১০৬১৮ (অ) ৭৭১২৪৩৬ (বা)
পশুসম্পদ অধিদপ্তর	**ফ্যাক্স** ৯১১০৩২৬
ডঃ সালেহ উদ্দিন মাহমুদ মহাপরিচালক	৮১১৫৫৩২ (অ) ৮১৫৮৮৯০ (বা)
জনাব সুনীল চন্দ্র ঘোষ পরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১২৩৮৮১ (অ)
জনাব মফিজুর রহমান পরিচালক (উৎপাদন)	৮৮২১৯৯১ (অ) ৯১১৪০৯৯(বা)
ডঃ কাজী মোঃ ইমদাদুল হক মহাপরিচালক, পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৭৭০৮৩২০ (অ) ৯১৩০৫৭৬ (বা)
পরিকল্পনা কমিশন শেরেবাংলানগর, ঢাকা	

নাম ও পদবী	ফোন নং
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা স্বাদু পানি উপকেন্দ্র, যশোর	০৪২১/৭৪০৪৩(অ)
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি	০৩৫১/৬২১৫৯(অ)
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা	**ফ্যাক্স:৮৮-০২-৯৫৬৩৯৯০**
জনাব মোঃ শরীফ তৈয়বুর রহমান চেয়ারম্যান	৭১৬২০০১(অ) ৯৬৬৩৬৪২ (বা)
জনাব মোঃ তাইয়েবুর রহমান পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৩৯৭৫(অ) ৯৩৫৪৮৬৯(বা)
জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন সচিব	৯৫৫২৬৮৯ (অ) ৮৩৬২১৮৯ (বা)
জনাব এম সফিকুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (বাস্তবায়ন)	৯৫৬১২৭২ (অ) ৮১২৬১৬৯ (বা)
জনাব মোঃ ইসহাক ব্যবস্থাপক ক্রয় বিভাগ	৯৫৫২০৭৬/২(অ) ৯০০৮১৪৯ (বা)
জনাব নূরু-উন নবী সরকার মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর	০৩১/৬১৩০০৬ (অ) ০৩১/৬৫৬১৮৬ (বা)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেইট, ঢাকা	
ডঃ এম নুরুল ইসলাম চেয়ারম্যান	৮১১৪০৩২
ডঃ খবীর আহমেদ মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৮১১০৬১৮ (অ) ৭৭১২৪৩৬ (বা)
পশুসম্পদ অধিদপ্তর	**ফ্যাক্স** ৯১১০৩২৬
ডঃ সালেহ উদ্দিন মাহমুদ মহাপরিচালক	৮১১৫৫৩২ (অ) ৮১৫৮৮৯০ (বা)
জনাব সুনীল চন্দ্র ঘোষ পরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১২৩৮৮১ (অ)
জনাব মফিজুর রহমান পরিচালক (উৎপাদন)	৮৮২১৯৯১ (অ) ৯১১৪০৯৯(বা)
ডঃ কাজী মোঃ ইমদাদুল হক মহাপরিচালক, পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৭৭০৮৩২০ (অ) ৯১৩০৫৭৬ (বা)
পরিকল্পনা কমিশন শেরেবাংলানগর, ঢাকা	

নাম ও পদবী	ফোন নং
পরিকল্পনা সদস্য, (কৃষি)	৮১১৫২৪২
বিভাগীয় প্রধান (কৃষি)	৮১১৫৮০৮
যুগ্ম-প্রধান (মৎস্য)	৮১১৪৭৩১
উপ-প্রধান (মৎস্য)	৯১১৭৫০৬
সিনিয়র সহকারী প্রধান (মৎস্য)	৯১১৪৬৫৭
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।	
জনাব সুভাষ চন্দ্র রায় সচিব	৮১১৫০২৬ (অ)
বেগম রোকসানা বেগম মহাপরিচালক (কৃষি)	৮১১২৭১৩ (অ)
জনাব আ.ন.ম রোকন উদ্দিন উপ-পরিচালক (মৎস্য)	৯১৩৩৬৪০ (অ)
রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো	
ভাইস চেয়ারম্যান	৯৫৬৫২৫৮
মহা পরিচালক	৯৫৬৪৩২২
উপ-পরিচালক **মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর**	৭১৬৯৪৫৪ (অ) ৭১৬৭১৫২ (বা)
অধ্যক্ষ **মেরিন ফিসারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম**	০৩১/৬৩৪৩৭৫
সভাপতি **মেরিণ ফিসারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা**	৮১২২১৫৯(অ) ৮১১৭৩০৯(বা)
সভাপতি **হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীকারক সমিতি**	**৮৩১৭৫৩১**
সভাপতি, ট্রলার এসোসিয়েশন, ঢাকা	৮১১১১৯৭
ঢাকাস্থ আন্তর্জতিক সংস্থা	
বিশ্ব ব্যাংক	৯৬৬৯৩০১-৮
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	৯৩৩৪০১৭-২২
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী	৮১১৬৩৪৪-৮
এফ এ ও	৮১১৮০১৫-৮
ইউ এন ডি পি	৮১১৮৬০০-০৬
ওয়ার্ল্ড ফিশ সেন্টার	৮৮১৩২৫০
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	৯৮৬২১৯৯
আই ইউ সি এন	৯৬৬৪৯৩০
জাইকা	৮১২৪৫৫১-৩

নাম ও পদবী	ফোন নং
ইউ এস আই ডি	৮৮৪৭০০-২২
আই এম এফ	৯৫৫০২৭৫
ইউনিসেফ	৯৩৩৬৭০১-২০
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	৯৫৬৯৩২০
সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম	
জনাব সাব্বির আহমদ পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), সামুদ্রিক মৎস্য	০৩১/৭২১৭৩১(অ)
জনাব মোঃ আলী আজম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সামুদ্রিক)	০৩১/৭২৪২০৬(অ)
সহকারী পরিচালক	০৩১/৭২০৯১৮(অ)
মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ	
জনাব মোঃ সানাউল্লাহ, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী, সাভার, ঢাকা	৭৭১২৫১৮ (অ)
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষীপুর	০৩৮১/৫৫২০৮-৩৭
অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফরিদপুর	০৬৩১/৬২৪৫৭
অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চাঁদপুর	০৮৪১/৬৩৪০২
মৎস্য হ্যাচারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪/৭৪৪০১/ ৭৪৪০২ (অ)
মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহঃ	
জনাব ইমতিয়াজ আহমেদ উপ-পরিচালক, ঢাকা	৭১৬৮৩৮০(অ)
জনাব নূরুল আলম, উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম	০৩১/৬৮২৬০৩ (অ)
জনাব মোঃ আনিছুর রহমান ভূইঁয়া উপ-পরিচালক, খুলনা	০৪১/৭৬০৪৯৫ (অ)
ঢাকার বাহিরে অবস্থিত প্রকল্প সমূহ	
ডঃ মমতাজ উদ্দিন প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প (ইফাদ), ফরিদপুর	০৬৩১/৬৩৯৮১ (অ)
জনাব ওয়াহিদুন্নবী চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক পটুয়াখালী-বরগুনা মৎস্য সম্প্রসারণ	০৪৪১/৬২১৬৯(অ)

নাম ও পদবী	ফোন নং
প্রকল্প, পটুয়াখালী	
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক বৃহত্তর নোয়াখালী মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প	০৩২১/৬১৪৭৩ (অ)
জনাব স্বপন কুমার দেব প্রকল্প পরিচালক ছড়া বিলে মাছ চাষ উন্নয়ন প্রকল্প	০৫৮১/৬১৫০১ (অ)
জনাব চন্দ্র কুমার চাকমা প্রকল্প পরিচালক পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী জলাশয়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প	০৩৫১/৬২৩২৭ (অ)
জনাব জাফর আহমেদ প্রকল্প পরিচালক কোস্টাল এমপাওয়ারমেন্ট প্রকল্প, কক্সবাজার	০৩৪১/৬৪৫৪৩ (অ)
ঢাকা বিভাগ	
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ	৯৫৫০৮২২ (অ) ৯১৩৩২৬৪ (বা)
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা	৯৫৬৯৯৫৩
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ	০৬৫১/৬১৩৯১
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুন্সিগঞ্জ	০৬৯১/৬২৫৯১
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর	৯২৫২৫২০
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নরসিংদী	০৬২৮/৬২৪১০
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নারায়গঞ্জ	৭৬৩০৬২৫
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদপুর	০৬৩১/৬৩২২৩
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজবাড়ী	০৬৪১/৬৫৫৮৩
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাদারীপুর	০৬৬১/৫৫৪৪২
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ	০৬৬৮/৫৫৪৫৪
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শরীয়তপুর	০৬০১/৫৫৬৫৬
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ	০৯১/৫৪৭৪৮
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ	০৯৪১/৫৫৪৬৭
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নেত্রকোনা	০৯৫১/৬১৪০৪
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জামালপুর	০৯৮১/৬৩৬২০
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর	০৯৩১/৬১৪৪৭
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টাংগাইল	০৯২১/৫৩৬৭৮

নাম ও পদবী	ফোন নং
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক বৃহত্তর নোয়াখালী মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প	০৩২১/৬১৪৭৩ (অ)
জনাব স্বপন কুমার দেব প্রকল্প পরিচালক ছড়া বিলে মাছ চাষ উন্নয়ন প্রকল্প	০৫৮১/৬১৫০১ (অ)
জনাব চন্দ্র কুমার চাকমা প্রকল্প পরিচালক পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী জলাশয়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প	০৩৫১/৬২৩২৭ (অ)
জনাব জাফর আহমেদ প্রকল্প পরিচালক কোস্টাল এমপাওয়ারমেন্ট প্রকল্প, কক্সবাজার	০৩৪১/৬৪৫৪৩ (অ)
ঢাকা বিভাগ	
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ	৯৫৫০৮২২ (অ) ৯১৩৩২৬৪ (বা)
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা	৯৫৬৯৯৫৩
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ	০৬৫১/৬১৩৯১
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুন্সিগঞ্জ	০৬৯১/৬২৫৯১
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর	৯২৫২৫২০
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নরসিংদী	০৬২৮/৬২৪১০
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নারায়গঞ্জ	৭৬৩০৬২৫
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদপুর	০৬৩১/৬৩২২৩
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজবাড়ী	০৬৪১/৬৫৫৮৩
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাদারীপুর	০৬৬১/৫৫৪৪২
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ	০৬৬৮/৫৫৪৫৪
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শরীয়তপুর	০৬০১/৫৫৬৫৬
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ	০৯১/৫৪৭৪৮
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ	০৯৪১/৫৫৪৬৭
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নেত্রকোনা	০৯৫১/৬১৪০৪
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জামালপুর	০৯৮১/৬৩৬২০
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর	০৯৩১/৬১৪৪৭
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টাংগাইল	০৯২১/৫৩৬৭৮

নাম ও পদবী	ফোন নং
খুলনা বিভাগ	
জনাব জয়দেব কুমার বিশ্বাস উপ-পরিচালক, খুলনা বিভাগ, খুলনা	০৪১/৭৬২৬৩৫(অ)
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খুলনা	০৪১/৭৬৩০১৬
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতক্ষিরা	০৪৭১/৬৩৩১৮
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগেরহাট	০৪৬৮/৬২৪৪৫
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, যশোর	০৪২১/৬৫৭৫২
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিনাইদাহ	০৪৫১/৬২৮৫৭
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নড়াইল	০৪৮১/৬২০৩৩
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাগুরা	০৪৮৮/৬২৩৪১
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া	০৭১/৬২১৮৯
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেহেরপুর	০৭৯১/৬২৫৪৩
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চুয়াডাংগা	০৭৬১/৬২৩৮৮
রাজশাহী বিভাগ	
জনাব মোঃ সিরাজুল করিম উপ-পরিচালক, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	০৭২১/৭৬০১৮৪(অ) ০২/৮১৫৭৪৪৭(বা)
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী	০৭২১/৭৬০২৪৫
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোর	০৭৭১/৬২৫৯০
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নওগাঁ	০৭৪১/৫২৩৮৫
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাপাইনবাবগঞ্জ	০৭৮১/৫৫৪৮২
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাবনা	০৭৩১/৬৬০৬৮
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ	০৭৫১/৬২১৩৭
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালমনিরহাট	০৫৯১/৬১৩৪৬
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাইবান্ধা	০৫৪১/৬১৬৪৩
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রংপুর	০৫২১/৬২৯২৯
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম	০৫৮১/৬১৫০১
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নীলফামারী	০৫৫১/৬১৫৭০
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জয়পুরহাট	০৫৭১/৬২২২৪
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বগুড়া	০৫১/৭৩৬৪১
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পঞ্চগড়	০৫৬৮/৬১৩৬৯
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঠাকুরগাঁও	০৫৩১/৬৪৪৮৬
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিনাজপুর	০৫৩৩৪/৭৪৩২৪
চট্টগ্রাম বিভাগ	
জনাব আব্দুল খালেক উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা	০৮১/৭৬১২৭(অ)
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম	০৩১/৬৫০৬০৯

নাম ও পদবী	ফোন নং
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার	০৩৪১/৬৩২৬৮
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেনী	০৩৩১/৭৪০৪৬
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁদপুর	০৮৪১/৬৩১৬৫
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বি-বাড়ীয়া	০৮৫১/৫২৫০১
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমিল্লা	০৮১/৭৬১৫১
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাংগামাটি	০৩৫১/৬২৩২৭
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বান্দরবান	০৩৬১/৬২৩৩৮
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি	০৩৭১/৬১৭২৬
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লক্ষীপুর	০৩৮১/৫৫৪৬৫
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নোয়াখালী	০৩২১/৬১৬৮১
সিলেট বিভাগ	
জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ উপ-পরিচালক, সিলেট বিভাগ, সিলেট	০৮২১/৮১০৫৩৩
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিলেট	০৮২১/৭১৬২৪১
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ	০৮৭১/৫৫৪৯০
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ	০৮৩১/৫২৫৪০
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৌলভী বাজার	০৮৬১/৫২৮১৩
বরিশাল বিভাগ	
জনাব আশরাফ আলী শেখ উপ-পরিচালক, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল	০৪৩১/৬৪৬২৭(অ)
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরিশাল	০৪৩১/৬৪০১৮
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভোলা	০৪৯১/৫৫৪০৭
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝালকাঠি	০৪৯৮/৬৩২৫৮
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরগুনা	০৪৪৮/৬২৩৯৬
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটুয়াখালী	০৪৪১/৬২১৬৯
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পিরোজপুর	০৪৬১/৬২৫৯৭

নাম ও পদবী	ফোন নং
জনাব মোঃ রবিউল আউয়াল মন্ডল তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)	৭১৬৯৪৫৩ (অ) ৯৬৭৩৭৪৮ (বা)
অর্জুন চন্দ্র চন্দ সহকারী পরিচালক	৯৫৬০৪৫৭ (অ) ৮১২১৫৫৬(বা)
ফিরোজা বেগম সহকারী প্রধান	৯৮৮৪৯১৩(বা)
মোঃ কফিল উদ্দিন কাইয়া সহাকারী পরিচালক	৯৫৬০৬৫৩(অ) ৮১১০২৬২(বা)
জনাব আবুল হাশেম সুমন সহকারী পরিচালক	৯৫৫৫৩৫১ (অ) ৮১২৪২১৬ (বা)
জনাব এ. বি. এম. জাহিদ হাবিব সহকারী পরিচালক	৯৫৬০৫১৭ (অ) ৮১৫৬০৪৮ (বা)
বিজয় রঞ্জন সাহা সহকারী পরিচালক	৯৫৬১৫৯২ (অ) ৯৩৫৯১৬১ (বা)
মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট ময়মনসিংহ	**ফ্যাক্স ০৯১-৫৫২৫৯**
ডঃ এম এ মজিদ মহাপরিচালক	০৯১/৫৪৮৭৪(অ) ০৯১/৫৫৪১০(বা)
ডঃ এম জি হোসেন পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা)	০৯১/৫৪০১০(অ) ০৯১/৫৪৩৭৫(বা)

নাম ও পদবী	ফোন নং
ডঃ মোঃ জাহের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	০৯১/৫৪২২১(অ) ০৯১/৫৪৩৭৫(বা)
ডঃ সালেহ উদ্দিন আহমেদ মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, চাঁদপুর নদী কেন্দ্র	০৮৪১/৬৩৪০৭(অ) ০৮৪১/৬৩১৩২(বা)
ডঃ ইউসুফ হারুন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কক্সবাজার সামুদ্রিক কেন্দ্র	০৩৪১/৬৩৮৫৫(অ) ০৩৪১/৬৩২২৭(বা)
ডঃ জাহাঙ্গীর আলম, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, খুলনা লোনা পানি কেন্দ্র	৪০২৭/৩৩০(অ) ৪০২৭/৩০৭(বা)
জনাব মোঃ নূরুল্লাহ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সদর দপ্তর	০৯১/৫৫১৬৪(অ) ০৯১/৫৪৩৭৫(বা)
উপ-পরিচালক সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ	০৯১/৫৫১৬৪(অ) ০৯১/৫৪১৪৮(বা)
উপ-পরিচালক স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	০৯১/৫৪৪৮৬(বা)
উপ-পরিচালক স্বাদু পানি উপকেন্দ্র, শান্তাহার, বগুড়া	০৭৪১/৫৫৩১২(অ)

মৎস্যচাষ উপকরণসমূহের প্রাপ্তি স্থান

মোঃ মনিরুজ্জামান
বিজয় রঞ্জন সাহা
আবুল হাসেম সুমন

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	উপকরণাদির নাম
১।	সেমকো সুবাস্তু টাওয়ার (১২ তলা) ৬৯/১, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫ ।ফোন-৮৬১০৮১৯-২১	রোটেনন, রটিফার, আটিমিয়া, সেফুফন-৮০ এমসি, কেল্লমিল, চিংড়ি ও মৎস্য খাবার ।
২।	Aquatic Tech and Trade(Pvt) Ltd ৬৭/এ, সেন্টাল রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা । ফোন- ৮৬১৬৭১০,ফ্যাক্স-৮৬১১৯৯৭	চিংড়ি ও মৎস্য খামারের যন্ত্রপাতি আটিমিয়া, রটিফার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, এয়ার ব্লোয়ার ।
৩।	প্রগতি ফিস লিমিটেড, কেডি-এ এ্যাভিনিউ, খুলনা । ফোন- ০৪১-৭২৪৫৭৭, ৭২২৩৬৭	চিংড়ি ও মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী
৪।	নিরিবিলি ফিস ফিড মিলস লিঃ শহীদ সরণী, হোটেল নিরিবিলি, কক্সবাজার ফোন- ০৩৪১-৪৩২৪	চিংড়ি ও পাংগাস মাছের পিলেট খাদ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী
৫।	ওরিয়েন্টাল ফিস ফিড ইটাখোলা, নরসিংদী । মোবাইল- ০১৭১৩৩০২১৭	মাছের পিলেট খাদ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী
৬।	সৌদি বাংলা ফিস ফিড লিমিটেড ব্র্যাক সেন্টার(১০ম তলা), ৭৫, মহাখালী, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা -১২১২, ফোন-৯৮৯৩৭১৬, মোবাইল: ১৭১৬২৭৬৮২	চিংড়ি, পাংগাস মাছের খাদ্য প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী
৭।	কোয়ালিটি ফিড্স লিমিটেড বাড়ী নং- ১৫ (৩য় তলা), সড়ক নং- ৮, সেক্টর- ৩, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০ । ফোন- ৮৯৬০২৪-৫	চিংড়ি, পাংগাস ও অন্যান্য মৎস্য এবং পোল্ট্রী খাবার প্রস্তুতকারক

৮।	ইউরো এশিয়াটিক ২৮/এ, নয়াপল্টন (৩য় তলা) ঢাকা- ১০০০। ফোন- ৯৩৩৪৬৬৪	ফিস ফিড, হ্যাচারীর যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী।
৯।	এম এ সামাদ ৮৫/এ ,তেজকুনি পাড়া, তেজগা, ঢাকা। মোবাইল-০১৭১৩১৩৬৭৯ , ৯১২১১৫৪	এরেটর (প্যাডল হুইলার) এয়ার ব্লোয়ার, পিজি, এইচ সি জি, এল, আর, এইচ, ডম ইত্যাদি।
১০।	ক্রিসেন্ট গ্রুপ অব কোম্পানীজ ৩৬, তোপখানা রোড, ঢাকা-১২০০ ফোন- ৯৫৬২৫০৮, ৯৫৬২৯৬৯	এরেটর , পিলেট মেশিন এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি
১১।	হালিম ফাউন্ডেশন ৩২, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ, ঢাকা- ১০০০	আর্টিমিয়া, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি
১২।	ডি, ইউ ইনস্ট্রুমেন্ট ৩২, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ, ঢাকা- ১০০০	মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি
১৩।	এসেনসিয়াল সাইন্টিফিকস ৩২, শহীদ নজরুল ইসলাম সড়ক,হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩, ফোন- ৭১৭৫৮৪২, ৭১৬৫১৬৯, ৭১৬৫১৬৯, মোবাইল: ০১৭৩০০৩৮১৪,	পানি পরীক্ষার কীট বক্স,ও বিভিন্ন হ্যাচারীর যন্ত্রপাতি
১৪।	রোন পুল্যাংক এগ্রোভেট বাংলাদেশ লিঃ ২৯, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ফোন- ৮৬১৯৩৪৬	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স
১৫।	এগ্রোকেয়ার লিঃ হেড অফিস ১৯, কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ ফোন: ৮৮১২২৭৮ ক) ১২৭/২, শাহ আলীবাগ, মীরপুর-১, ঢাকা। ফোন- ৮০১৭১১৯,৮০১১১৫৪ খ) হোটেল সীভিউ লিঃ রুম নং- ২০১, কক্সবাজার। ফোন- (০৩৪১) ৪৪৯১, ৩৫১৮	আর্টিমিয়া, আর্টিমিয়া ফ্লেপ, এ,পি, স্পাইরোলিনা
১৬।	মেসার্স রশিদ পিটুইটারী ইন্ডাস্ট্রি পুলের হাট, বেনাপোল রোড, যশোর। হেড অফিস ঃ ফোন- (০৪২১) ৩৯০৫ খ) পূর্ণমনি এন্টারপ্রাইজ মাসকান্দা, ময়মনসিংহ। ফোন- (০৯১) ৫৪১৫৮ গ) মোঃ শাহাজান মিয়া ধলা বাজার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ঘ) আলহাজ্ব আবদুল ওহাব ৮১/৩, শুক্রাবাদ, ঢাকা। ফোন- ৯১৩১৬৯২ ঙ) শ্রী বিশ্বনাথ সরকার শাহাপুর, শান্তাহার, নওগাঁ রোড, বগুড়া। চ) কল্পতরু মৎস্য হ্যাচারী প্রোঃ ডাঃ সুলতান আহমেদ কোম্পানীগঞ্জ, কুমিল্লা। ছ) মোঃ মফিজ মজুমদার, রায়পুর, লক্ষীপুর। জ) আল-মদিনা মৎস্য হ্যাচারী, তেমুহনী, মহিপাল, ফেনী। ফোন- (০৩৩১) ৭৩৬৬৫ ঝ) নবীন মৎস্য হ্যাচারী প্রোঃ মোঃ মোস্তফা মিয়া রেল ষ্টেশন গেট, নাটোর। ফোন- (০৭৭১) ৬৬৮৩	পিজি, এইচ সিজি, ক্লোরন, ওভাপ্রিম।

১৭।	গোল্ড কোষ্ট শ্রিম্প হ্যাচারী হ্যাচারী জোন, মেরীন ড্রাইভ রোড কলাতলী, কক্সবাজার। ফোন- (০৩৪১) ৪৭২০	চিংড়ি হ্যাচারী ও মৎস্যচাষ সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি, ঔষধ, আর্টিমিয়া, খাদ্য।
১৮।	জেনারেল ডাইনামিক্স লিঃ মডার্ন ম্যানশন (১১ তলা) ৫৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। ফোন- ৯৫৫৭১৪০	এ্যাকোয়াকালচার ইকুইপমেন্ট এবং কেমিক্যাল,
১৯।	লাকি স্টোরস, কে,সি,ডে, রোড, চট্টগ্রাম। ফোন-(০৩১) ২২৩১১০	চিংড়ি ও মাছের খাদ্যে ব্যবহৃত প্রিমিক্স
২০।	প্যারাগন এন্টারপ্রাইজ লিঃ ১৩/৫, আউটার সার্কোলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।	মৎস্য সম্পর্কিত বিভিন্ন দ্রব্য।
২১।	জেনেটিকা ১১৪, মতিঝিল বা/এ, রেড ক্রিসেন্ট ভবন, ঢাকা-১০০০। ফোন- ৯৫৫১৩১৩	মাইক্রো ব্যাক্টার (পানি পরিশোধক), স্টোরিডোল-২০ (পানি দুষন নিয়ন্ত্রক এবং মৎস্য রোগ প্রতিরোধক) মাইক্রো ব্লু (শৈবাল নামক) মাইক্রো পার্ল, মোল্ট- ৭ (চিংড়ির খোলস পাল্টানোর সহায়ক সম্পুরক খাদ্য) এম এইচ-১০ (পুকুরে মাছের খাদ্যের অভাব পুরনকারী)
২২।	কাজী মহিউদ্দিন/কাজী রিয়াজ মাহবুব ১২/৬, সলিমুল্লাহ রোড,মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১০২৭ ফোন:৮১২০২৬৪(অফিস), ৯০০১৭৩১(বাসা) মোবা: ০১৯৯৩৮৮৬৭২৬, ০১৭১৩৫৯১৯৪	পিজি ,এইসিজি, ফসটকসিন, কুইকফস, রোটেনন,আর্টিমিয়া, ওভাপ্রিম, ও মাছ চাষের যাবতীয় উপকরণ পাওয়া যায়।
২৩।	এ, ইন্ট্রাকো (বাংলাদেশ) লিঃ ১১৪, মতিঝিল বা/এ, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং (২য় তলা), ঢাকা-১০০০	মোল্ট-৭, এম এইচ-১০
২৪।	এগ্রোসার্ভ, রেড ক্রিসেন্ট ভবন (৩য় তলা) ১১৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	মোল্ট-৭ এম এইচ-১০, (জৈব রাসায়নিক সার)
২৫।	ইতালী এগ্রিকালচার মেডিসিন ২১১/১, আলী মার্কেট, কুড়িল চৌরাস্তা, বিশ্বরোড, ঢাকা ক্যান্ট- ঢাকা-১২১২	মোল্ট-৭ এম এইচ-১০
২৬।	বাংলাদেশ এগ্রো লাইভষ্টক ফাউন্ডেশন ৯, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, হোটেল ডন প্লাজা, (৪র্থ তলা), ঢাকা।	ফিসমিল, মাইক্রো ফার্টিলাজার।
২৭।	আরিফ বানিজ্য বিতান কাচারী রোড, টংগী বাজার।	রোটেনন, মাছের খাদ্য, ভিটমিন প্রিমিক্স।
২৮।	ক) স্বাদু পানিকেন্দ্র বাংলাদেশ মৎস্য গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ময়মনসিংহ। ফোন- (০৯১) ৫৪২২১ খ) নদী কেন্দ্র বাংলাদেশ মৎস্য গবেষনা ইনষ্টিটিউট, চাঁদপুর	গিফট তেলাপিয়া, উন্নত রাজপুটি, উন্নত রুই ও কাতলা, দেশী শিং ও মাগুর, মহাশোল মাছ, কমন কার্প, পাবদা, গুলশা, বাটা, ঘনিয়া, রেবা, কালিবাউশ, দেশী সরপুটি ও গলদা চিংড়ি
২৯।	আইডিয়াল ট্রেডিং লিঃ ৯০, নিউ এলিফান্ট রোড (৩য় তলা),ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫। ফোন-৮৬২৭৫০৩, মোবাইল- ০১৮২১৯৭২৫	ডলো চুন আমদানীকারক
৩০।	মিডওয়েসাইন্টিফিক ফিসারীজ লিঃ থানা রোড কক্সবাজার ফোন ০৩৪১-৬৩৫৪২, মোবা: ০১৭২-২০৩২০৮,০১৭১-১২২৫৩৮, ০১৮৮০৬৩৮৭	মনোসেক্স তেলাপিয়া সরবরাহকারী
৩১।	সাহারা ইন্টারন্যাশনাল , ১১১, মনোহরপুর উত্তর সোনালী ব্যাংক রোড , কুমিল্লা , ফোন-০৮১-৬৫৯২৬, মোবা: ০১৭১২৪৪২১১	মনোসেক্স তেলাপিয়া সরবরাহকারী
৩২।	মেসার্স এম আর এন্টারপ্রাইজ ফুড এন্ড প্রোটিন ইন্ড্রাষ্ট্রিজ, ১১/৩, মীরবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। ফোন-৯৩৪১৫৯৮ মোবাইল: ০১৭২-১২৫৫৭৩,০১৭৬-৬৮২১০৭	ফিস কিউরেপাস (মাছের রোগের ওষুধ), ফিস কিউরে ভিটা, ফিস গোল্ড, মৎস্য খাদ্য প্রস্তুত করা মেশিন

৩৩।	বারাহিগুনা মৎস্য প্রকল্প বাড়ী-৫,রোড-২,ব্লক-এ,নবদিয়া আবাশিক এলাকা,মোহাম্মদপুর ঢাকা । ফোন-৯১২৬৭৩০.০১৭২১০৫৬০৪	দেশী মাগুর,শিং ও পাবদার পোনা সরবরাহকারী
৩৪।	ব্রহ্মপুত্র ফিশ সীড কমপ্লেক্স গ্রাম-চরপুলিয়া মারী ডাকঘর-শম্ভুগজ্জ,ময়মনসিংহ ০৯১-৫২৫৩৩,০১৭১-৩৩৫০৪৫,০১৭১-৩১৫৬৯৫	দেশী মাগুর,শিং ও পাবদার পোনা সরবরাহকারী
৩৫।	ইউনাইটেড একোয়া ফার্ম লিঃ বনশ্রীএলাকা ,মৌলভী বাজার ফোন: ০৮৬১-৫৩৮৮৫ মোবা: ০১৭১৯২৩০১১	মনোসেক্স তেলাপিয়া সরবরাহকারী
৩৬।	গোলন্দাজ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ রোড ১৭ বাড়ী ৪১ নীকুঞ্জ ২ খিলক্ষেত, ঢাকা ফোন ৮৯১১৮৫৮,৮৯২৩০০৬	মাছের খাদ্য তৈরী মেশিন
৩৭।	হেমি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ ৭৩, শান্তিনগর (চতুর্থ তলা),ঢাকা-১২১৭ ফোনঃ ৯৩৪৩৮৫৬, ৮৩১৮৩৬১	বানিজ্যিক মৎস্য ও পল্ট্রি খাদ্য তৈরী মেশিন,মৎস্য সুটকীকরণ মেশিন,শিল্পের কাচা মাল আমদানীকারক
৩৮।	ইউনিভেট লিমিটেড বাড়ীনং ১১৩ সড়ক নং ১৩ ব্লক-ই বনানী, ঢাকা-১২১৩ ফোনঃ ৮৮১১৯৭১,৮৮২৯৫৩৭,৮৮১৪০৮৭, ৯৮৯৪২৩০ ফ্যাক্সঃ ৯৮৮৫৮৭৬	পিএইচ,এমোনিয়া টেস্ট কীট,মেজর জিওলাইট,বেস্ট অক্সিজেন,গোল্ডেনব্যাক, ড্রপার আমদানীকারক
৩৯।	ইউনাইটেড ফিসারিজ ৩২৭/৪,দক্ষিন যাত্রাবাড়ী ,ডেমড়া ঢাকা-১২০৪ মোবাইলঃ ০১৭২১২৫৬৮৮, ০১৮৯৯৯৭২৪০	মনোসেক্স তেলাপিয়া ,হাইব্রীড রুই ,পাবদা, থাই কৈ, দেশী মাগুরগুচিতল মাছের পোনা সরবরাহকারী
৪০।	সুপার এগ্রো ফিডস লিঃ বাড়ী-৭, রোড-৬/এ,সেক্টর-৪,উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ ফোনঃ ৮৯৬২০১৩	পাংগাস , কার্প, থাই কৈ, মনোসেক্স তেলাপিয়ামাছ ও চিংড়ির খাদ্য প্রস্তুতকারক
৪১।	EON Animal Health House-364 Road-27 New DOHS , Mohakhali ,Dhaka-1206, Tel:8825085(O)	Temsen ,madicine for bacteria, Virusand parasite
৪২।	NICE Enterprise,49 Matijheel C/A,Room-507(4Th Floor)Tel: 0173023869	Feed Mill and Agro Product Importer
৪৩।	৫মেসার্স মিজান এন্টারপ্রাইজ ৩৫, গাওয়াইর দক্ষিন খান রোড, উত্তরা ঢাকা ১২৩০ । ফোনঃ ৮৯২২৮৪৮,০১৮৯১২৬৯৫৯	মনোসেক্স তেলাপিয়া ,হাইব্রীড রুই ,পাবদা, থাই কৈ, দেশী মাগুর ও চিতল মাছের পোনা সরবরাহকারী
৪৪।	বাংলাদেশ ইনটিগ্রেটেড ফিসারি এন্ড পোলট্রি লিঃ ৯/এ টয়েনবি সার্কুলার রোড নিরালা ভবন মতিঝিল (৩য় ও ৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০ ফোনঃ ৯৫৫৮৩৪৮, ৯৫৬১৮৬২, ৯৫৭২২৬৮-৯,	ভাসমান মৎস্য খাদ্য সরবরাহকারী
৪৫।	বেঙ্গল ওভারসীজ লিমিটেড প্যারাগন হাউজ (৭ম তলা) ৫, মহাখালী বা/এ ,ঢাকা-১২১২ ফোন-৯৮৯৪৩৫৫/৬৬/৭৭,ফ্যাক্স-৯৮৯৩৬২৪	আর্টিমিয়া, ভিটামিন, মিনারেল প্রিমিক্স, পিজি, এইচ,সি,জি ক্লোরন, রটিফার, ওভাপ্রিম ইত্যাদি ।
৪৬।	মমিন এন্টারপ্রাইজ,৮৯, মতিঝিল বা/এ , ঢাকা-১০০০ ফোনঃ ৯৫৫৩০৭১,৭১৬১৬৬৬ মোবাঃ ০১৭১৬৩৫৪৩২	ফিড মিল,ফিস মিল , মৎস্য খাদ্যের উপকরন আমদানীকারক
৪৭	নোভাট্রিস (বাংলাদেশ) লিঃ হাউজ নং-৫০, রোড নং-২/১, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ঢাকা-১২০৯, টেলিফোন-৮৬১৫৩০২-৮	জিওটক্স, অক্সিফ্লো, মেগাভিট এ্যাকোয়াবুষ্ট ইত্যাদি
৪৮।	দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী মৎস্য খামার প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করে পোনার প্রাপ্তি স্থান জেনে নেয়া যাবে ।	রুই জাতীয় পোনা, রাজপুটি, গিফট তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, পাংগাস ইত্যাদি